মে ২০২০ ❑ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

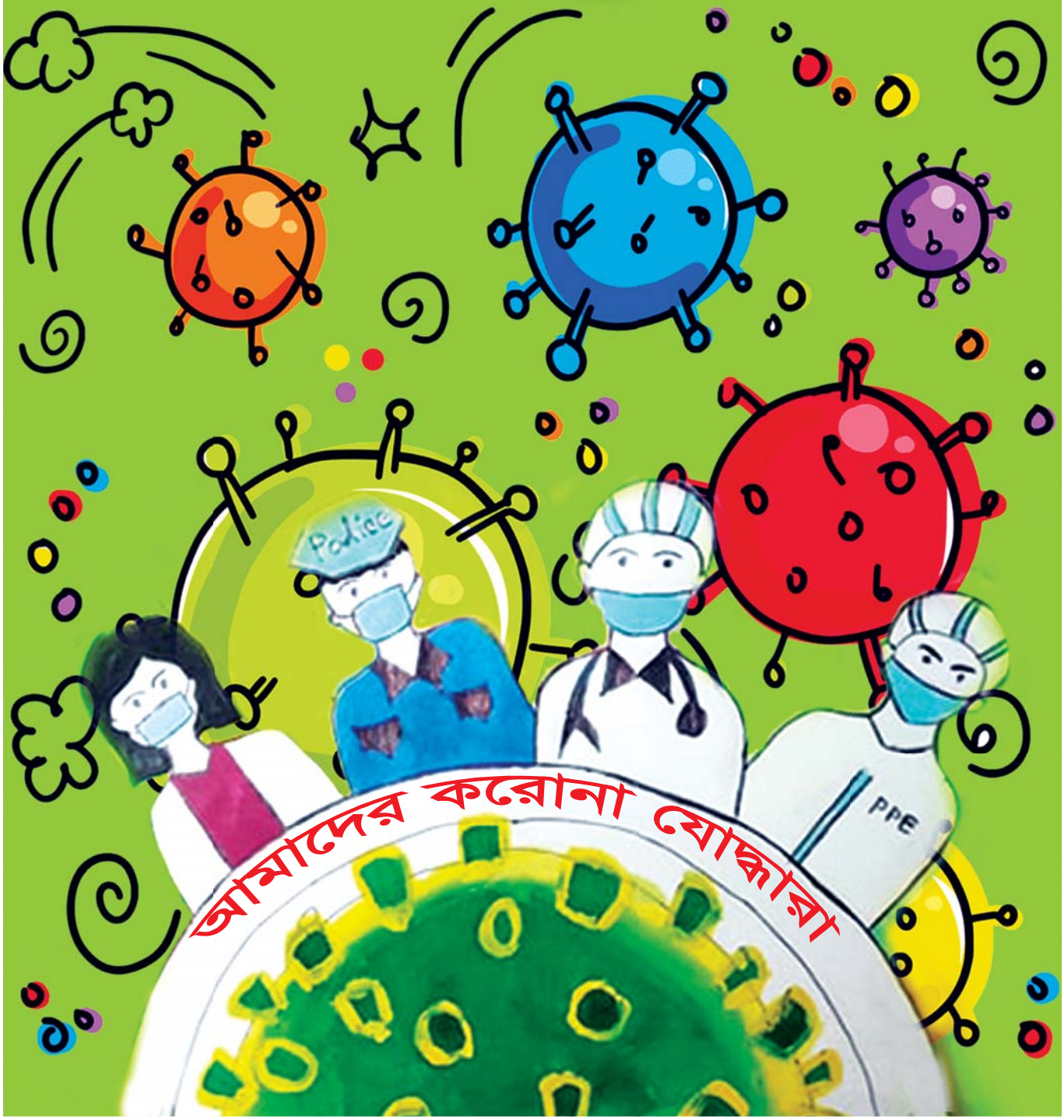

আমাদের করোনা যোদ্ধারা

পারিজাত রাণী শ্রেয়সী, ৫ম শ্রেণি, সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রমিথি ত্রিপুরা, ৩য় শ্রেণি, ট্রিজার স্কুল, রাঙ্গামাটি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মে ২০২০ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

মে মাসের প্রথম দিনটি ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে মহান মে দিবস হিসেবে পালিত হয়। কিন্তু এবারের মে মাসে করোনা ভাইরাসে টালমাটাল পুরো বিশ্ব। তোমরা কিন্তু আতঙ্কিত হবে না ছোট্ট বন্ধুরা। তোমরা ঘরের বাইরে যাবে না এবং বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করবে। খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে এ রোগকে প্রতিরোধ করতে হবে।

লকডাউনে যখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে তখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষার্থীরা যাতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) দ্বারা আক্রান্ত না হয় সেজন্য এখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়া হবে না। কারণ এরা আমাদের ভবিষ্যৎ। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ বিষয়টি।

তাই বলে পড়াশুনা বন্ধ করে দিলে হবে না। তোমরা ঘরে বসেই সংসদ টিভিতে প্রচারিত 'আমার ঘরে আমার স্কুল' নামে যে ক্লাস হচ্ছে তা নিয়মিত করবে। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলেও আলাদা করে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, সেটা নিয়মিত করবে। তাহলে ঘরে বসেই তোমরা তোমাদের সিলেবাস শেষ করতে পারবে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসের নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে এসেছিলেন ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। তাই মে মাসের ১৭তম দিবসটি আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধুরা, ৮ই মে বিশ্ব মা দিবস। মা তো আমাদের সকলেরই প্রিয়, সবসময়ই প্রিয়। তারপরও এ দিনে মায়ের জন্য সারা বিশ্বের সব মানুষের মতো আমরাও যার যার মাকে নিয়ে বিশেষ আনন্দে মেতে উঠি।

গরমে সুস্থ থাকো আর সাবধানে থাকো– এই শুভকামনা রইল তোমাদের জন্য।

সূচি

মে দিবস উপলক্ষ্যে

০৩ ওদেরও স্বপ্ন আছে/মুস্তাফা মাসুদ

নিবন্ধ

০৯ অলক প্রেমী নজরুল/পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য
১১ গুগল-ডুডলে কবি নজরুল/মারুফা খানম
১৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মেজবাউল হক
১৫ আমাদের করোনা যোদ্ধারা/নুসরাত জাহান
১৬ শীর্ষেন্দুর স্বপ্নপূরণ/রাইসা রহমান
৪১ শিশুদের লকডাউন পালন/সাবিনা ইয়াসমিন
৫৪ করোনা যুদ্ধে আফিয়া/জান্নাতে রোজী
৫৫ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৫৬ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার/মো. জামাল উদ্দিন
৫৮ অনলাইন পড়াশুনা/তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও এপ্রিল ২০২০ -এর সমাধান

মা দিবস উপলক্ষ্যে

১৭ মায়ের ভালোবাসা/ শাহানা আফরোজ
২১ মায়ের ভালোবাসার জন্য/সালাম হাসেমী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

১২ বাতেন বাহার/ বশিরুজ্জামান বশির

ভাষা দাদু

৫২ শব্দ গঠন/তারিক মনজুর

গল্প

২৫ মুক্ত ডানার পাখি/খন্দকার নূর হোসাইন
২৯ সুলতান মাস্টার/মাহমুদুল হাসান খোকন
৩৪ লড়াই/ফজলে রাব্বী দ্বীন
৩৭ অসময়ের উপলব্ধি/কবির কাঞ্চন
৩৯ দায়/শফিক শাহরিয়ার
৪২ আকাশ পরি/সনজিত দে
৪৫ অনুশোচনা/মোহাম্মদ আবদুর রহমান
৪৭ হোম কোয়ারেন্টাইন/কাজী তানভীর
৫০ মায়ের আয়না/সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান

কবিতা

০৮ সালাম ফারুক
২৩ লামিয়া হোসেন
৩২ সায়মা আনজুম/ সাঈদ তপু
৩৩ ওয়াসিফা ইবনাত/ মো. রুস্তম আলী
৩৮ আলিফ হোসেন
৫৯ ইফতেখার আলম

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
পারিজাত রাণী শ্রেয়সী, প্রমিথি ত্রিপুরা

শেষ প্রচ্ছদ
কাজী নাফিসা তাবাস্‌সুম মাহী

৩১ মো. আবদুল্লাহ
৪০ ইশরা হোসেন
৪৯ শারিকা শাহনাজ
৫৭ ফাতিমা তাহানান
৬০ প্রাচুর্য রহমান/ আয়ান হক ভূঁঞা
৬১ কাজী হাসিব আল জাবির/ তাশদিদ তাবাসুম

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মে দিবস উপলক্ষ্যে

ওদেরও স্বপ্ন আছে

মুস্তাফা মাসুদ

ছেলেটির বয়স বারো কী তেরো বছর। তবে ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর হালকা-পাতলা চেহারার কারণে তাকে দেখলে মনে হয়, তার বয়স নয়/দশ বছরের বেশি হবে না। শরীরের তুলনায় মাথাটা একটু বেশি বড়ো। মাথার চুলগুলো উসকোখুসকো। এলোমেলো। কত কাল তাতে তেলের ছোঁয়া লাগেনি, কে জানে! পরনে একটা ছাই-রঙের হাফপ্যান্ট। খালি গা। প্যান্টে আর সারা গায়ে কালিঝুলি মাখা। সে একমনে কাজ করছে গাড়ি মেরামতের এক গ্যারেজের একটা মোটর সাইকেলের পাশে বসে, কখনো দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বড়ো রেঞ্চ আর একটা প্লাস। আরো টুকিটাকি যন্ত্রপাতি এখানে-ওখানে পড়ে আছে। রেঞ্চ আর প্লাসের সাহায্যে মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের উপরের ঢাকনি খুলছে সে। নাট-বল্টুগুলো খুলে খুলে রাখছে একটা প্লাস্টিকের পাত্রে। ইঞ্জিনে নাকি বড়ো ধরনের গ্যাঞ্জাম হয়েছে। সেই গ্যাঞ্জাম সারানোর জন্যই মোটর সাইকেলটিকে এই গ্যারেজে দেয়া হয়েছে। খুব নাকি আর্জেন্ট কাজ– কাল বিকেলেই ডেলিভারি দিতে হবে। তাই ছেলেটির কোনোদিকে খেয়াল নেই। দুপুরের রোদে সারা শরীর ঘামে জবজব, একটুও বিশ্রাম নিতে পারছে না সে। তবুও মাঝে মাঝে ওস্তাদ এসে হাঁক দিচ্ছে– অই নাজমুল্যা, অইলো তোর? এইটুক কাম এ্যাহনও শ্যাষ অইলো না, তয় আমি আসল কাম করুম ক্যামতে! চালা ব্যাটা, জোরে হাত চালা– বলেই মোটাসোটা চেহারার সেই ওস্তাদ গিয়ে বসে দোকানের দরজার পাশে

একটা টুলের ওপর। সেখানে বসলেও তার দুটো চোখ থাকে ছেলেটির দিকে। সেদিকে তাকিয়ে সে নিজের মনে গজগজ করে– ব্যাটা কুড়ের বাদশা একখান! বিশ মিনিটের কাম দ্যাড় ঘণ্টা লাগাইয়া দিব মনে অয়। না, ওরে দিয়া কাম চলব না...

এই ওস্তাদই গ্যারেজের মালিক এবং মূল মিস্ত্রি। নাম ইদ্রিস লস্কর। আর শ্রমিক 'নাজমুইল্যা'র ভালো নাম নাজমুল হোসেন। ওস্তাদ ডাকে নাজমুল্যা। তার দেখাদেখি গ্যারেজের অন্যরাও তাকে ওই নামেই ডাকে। এমনকি লস্করের সাত-আট বছর বয়সী একটা ছেলে আছে, সেও তাকে নাজমুল্যা বলে ডাকে আর দাঁত বের করে হাসে। এতে নাজমুলের খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। মুখ বুঁজে এক মনে কাজ করে যায় সে। কিছু বললে যদি চাকরিটা চলে যায়, তাহলে কী হবে– সে কথা চিন্তা করে ওর বুকের মধ্যে ধুকপুক করে।

সাংবাদিক রশিদ পারভেজ প্রতিদিন এ পথ দিয়েই অফিসে যাওয়া-আসা করেন। তিনি দৈনিক প্রভাতকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে সহসম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। 'ঢাকার জীবন' নামে দারুণ জনপ্রিয় একটি পাতার তিনি বিভাগীয় সম্পাদক। তার অফিস সকাল এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা। কিন্তু প্রায় দিনই অফিস থেকে বেরোতে রাত সাড়ে সাতটা/আটটা হয়ে যায়। নাজমুল যে-গ্যারেজে কাজ করে সেটি ওই পত্রিকা অফিসের কাছেই– পশ্চিম দিকে তিনটা বাড়ির পরে। রশিদ রোজ পায়ে হেঁটেই অফিসে যাওয়া-আসা করেন– তার ভাষায় যা এগারো (১১) নম্বর, মানে দুই পা। এ বিষয়ে তার যুক্তি হলো: মাত্র দু' মাইল পথ। দু'বার হেঁটে যাওয়া-আসা করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শরীরে ফ্যাট জমবে না। আর তার ফলে শরীরও ফিট থাকবে, মনটা চাঙা হবে। আবার রিকশাভাড়াও বাঁচবে।

রশিদ অফিসে যাওয়া-আসার পথে রোজই দেখেন নাজমুল ব্যস্তভাবে কাজ করছে। কখনো মোটর সাইকেল নিয়ে ব্যস্ত। কখনো প্রাইভেট কার আবার কখনো মাইক্রোবাসের এটা-সেটা কাজ নিয়ে তুমুল ব্যস্ত সে। তার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো আরো দুটো ছেলেকেও সেখানে কাজ করতে দেখা যায়। তাদের তুলনায় নাজমুল বয়সে ছোটো আর শীর্ণ দেহের হওয়ায় ওকে দেখলেই রশিদের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। তালের মতো বড়ো একটা মাথা শীর্ণ ঘাড়ের ওপর বড্ড বেমানান দেখায়। এই বেমানানের মধ্যে তার মুখটি খুব মায়া ভরা। চোখ দুটো বড়ো বড়ো আর উজ্জ্বল। নতুন কাজ শিখছে বলে নিজে থেকে কিছু করার অধিকার নেই নাজমুলের। ওস্তাদের হুকুম মতোই ওকে কাজ করতে হয়– এটাই এখানকার নিয়ম; যদিও এই ছয় মাসে হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখে ফেলেছে সে ।

আজ অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় গ্যারেজের কাছে একটু দাঁড়ালেন রশিদ পারভেজ। তাকে দাঁড়াতে দেখেই বড়ো ওস্তাদ ইদ্রিস লস্কর উঠে দাঁড়ায়। তারপর পান-রাঙানো মুখে হেসে বলে– ছারের কী গাড়িগুড়ির কাম আছে নাহি? থাকলে পাঠায় দিয়েন ছার। ঠিক কইরা দিমুনে। এক্কেরে নতুনের মতন কইরা দিমুনে ছার। ওস্তাদের হাসিটা রশিদের বেশ ভালো লাগে। তিনিও হেসে বলেন– একটু বসে কথা বলি? অমনি সাথে সাথে লোকটা হাঁক দেয়– অই নাজমুল্যা, এট্টু আয় তো! স্যারেরে একখান চেয়ার আইন্যা দে।

ওস্তাদের আদেশ পেয়ে চোখের পলকে ছুটে আসে নাজমুল। দোকানের মধ্য থেকে একটা চেয়ার এনে ওস্তাদের পাশে রেখে বলে– বসেন ছার, বসেন। রশিদ চেয়ারে বসে। নাজমুল তখনো দাঁড়িয়ে। এসময় লোকটা নাজমুলকে ধমক দিয়ে বলে– খাঁড়াইয়া রইছস ক্যান্ ফকিন্নির পুত! যা দুই কাপ চা লইয়া আয় তাড়াতাড়ি। এইডাও বুঝস না, সব কইয়া দিতে অইব!

নাজমুল দ্রুত চা আনতে পাশের ফুটপাতের ওপর গড়ে ওঠা চায়ের দোকান থেকে চা আনতে যায়। লোকটা সাংবাদিক রশিদ পারভেজের দিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি করে হেসে বলে– ছার, এইসব পোলাপানগো সাথে এভাবেই কথা কইতে হয়। না অইলে বিপদ। একটু হাইস্যা মণি-সোনা কইছেন তো অরা আপনার মাথায় উঠব। এভাবে ধমক আর চড়-থাপ্পড়ের উপর রাখবেন তো কাজ পাইবেন। তা কন ছার, আপনে কী কাম করাইবেন। হোম সার্ভিস? বাড়ি গিয়া করতে অইব...

লোকটি আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল। রশিদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন– দেখুন, ওসব কিছু না। গাড়িটাড়ির কাজও করতে হবে না। আমি একজন সাংবাদিক। এই যে– পাশে একটা দৈনিক পত্রিকার অফিস আছে না, আমি ওই অফিসে চাকরি করি। রোজ আপনার গ্যারেজের সামনে দিয়ে যাই। আপনাদের কাজকম্ম দেখি। তাই ভাবলাম, আপনার গ্যারেজের ওপর একটা ফিচার করি আমার পত্রিকায়...

এরিমধ্যে নাজমুল একটি টিনের প্লেটে করে চা নিয়ে হাজির। মুহূর্তে ওস্তাদ যেন অন্য মানুষ। সেই ডাকসাইটে মেজাজ আর নেই। মাখনের মতো নরম গলায় বলে– বাপ নাজমুল, এই দ্যাখো একজন বড়ো সাম্বাদিক। আমাগো গ্যারেজের পুব পাশে যে বড়ো দৈনিক পত্রিকার অফিস, ওই পত্রিকায় কাজ করেন উনি। তা বাপ, আজ আর তোমার কাজ করন লাগব না। আজ তুমি বাড়ি যাও। রাতও বেশ অইছে।

লোকটার কথা শুনে নাজমুল অবাক হয়। সে কিছুই বুঝতে পারে না। এমন কথা তো তার ওস্তাদ গেল ছয় মাসে একবারও বলেনি! বকাবাজি আর চড়-থাপ্পড় দেওয়াই তো তার স্বভাব। আজ ওস্তাদ এমন করছে কেন! ওস্তাদের মাথা ঠিক আছে তো! এসব কথা ভাবতে ভাবতে ওর আর যাওয়া হয় না। মূর্তির মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। নাজমুলের ভাবসাব বুঝতে দেরি হয় না ওস্তাদের। মুখে মধু ঝরিয়ে বলে– হ রে বাপ, ঠিকই কইতাছি। তুই অহন বাড়ি যা, অনেক রাত অইচে। আমি সাম্বাদিক ছারের লগে দুই-এট্টা কথা কমু।

এবার নাজমুলের বিশ্বাস হয় যে, তার ওস্তাদ ইদ্রিস লস্কর ঠিকই তাকে ছুটি দিয়েছে। অন্য দিনের চেয়ে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা আগে তাকে বাড়ি যেতে বলছে। বড্ড আউলা-ঝাউলা মনে হতে থাকে তার। কিন্তু আর কিছু না বলেই নাজমুল ফুটপাথ ধরে পশ্চিমমুখো হাঁটা শুরু করে। রশিদ খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। এক সময় রাস্তার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায় নাজমুল।

নাজমুল যাওয়ার পর রশিদ ইদ্রিস লস্করকে বলেন–আপনার গ্যারেজে শুধু শিশু ও কিশোর শ্রমিক কাজ করে দেখছি। যুবক বা বড়োরা নেই কেন? ইদ্রিসের মুখভরা হাসি। সেইসাথে তার দুটি চোখও হাসছে। সে হাসি যেন অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা সাথে সাথে ধরতে পারেন না রশিদ পারভেজ। কিন্তু তিনি এক ঝানু সাংবাদিক। বয়স চল্লিশের কোঠায় হলেও মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অনেক। তাই লস্করের বাঁকা হাসির মানে বুঝতে তার দেরি হয় না। তবুও তিনি চুপ করে থাকেন, লস্করের মুখ থেকেই তার প্রশ্নের জবাব শুনতে চান তিনি।

ইদ্রিস লস্কর তার গলার স্বরে দ্বিগুণ মধু মিশিয়ে বলে– ছার, এইডাও একটা টিরিক্স– মানে অইল গিয়া কৌশল। বড়ো মানুষ রাখলে রোজ পাঁচশ টাহা দেওন লাগে। আর ওগো স্রেফ দুইশ'/তিনশ টাহায় ফিনিশ। তয় আমি ছার, আরো কম দেই– ডাঙ্গর দুইডারে দুই শ' কইরা আর ওই পিচ্চি নাজমুল্যারে, থুড়ি ছার, নাজমুল এহেবারে নবিশ বলে ওরে দেই রোজ এক শ' টাহা। তাতেই ওরা খুব খুশি স্যার, খুব খুশি। আমারে তো বাপের মতনই মনে করে ওরা।

–এত কম টাকা বেতন দেন! রশিদ যেন আকাশ থেকে পড়েন। অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন–এত কম টাকা বেতন দেন ওদের? আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখনকার বাজারে দৈনিক একশ-দুশ টাকা দিয়ে কারো জীবন চলে না। তারপর হয়ত রয়েছে গরিব মা-বাপ। ছোটো ভাই-বোনও আছে কারো। তারা হয়ত এদের রোজগারের দিকেই চেয়ে থাকে...

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন রশিদ। আর তখনই কোট-টাই পরা এক বড়ো সাহেব গ্যারেজের সামনে গাড়ি থেকে নামেন। তার সাথে নামে তার

ড্রাইভারও। সাহেবটি লস্করের পূর্ব পরিচিত। তাকে দেখেই লস্কর মহা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুকনো মুখে রশিদের দিকে তাকিয়ে বলেন– সাম্বাদিক ভাই, আইজ আর কথা কইতে পারুম না। এই যে বহুত বড়ো ছার আইছেন। ওনার গাড়িতে কী জানি কী বড়ো গ্যাঞ্জাম হইছে। আমার বান্দা কাস্টমার। অহনিই দেখতে অইব। আপনি আরেক দিন আইসেন ভাই। খাতির জমাইয়া গপ্প করুম নে। তয় ওইসব বিষয় নিয়া প্যাঁচাল পাড়তে আমার ভালো লাগে না। আল্লায় ওগো গরিব বানাইছে, আপনি-আমি তার কী করতে পারি! সবই নসিব রে ভাই, সবই নসিব। বিধির বিধান খণ্ডাইব কে!

লস্করের কথা শুনে সাংবাদিক রশিদ পারভেজের দু' কান দিয়ে যেন আগুন বেরোতে থাকে। মাথা ঝা-ঝা করতে থাকে। বলে কী লোকটা! গরিব মানুষের এই ছেলেদেরকে সে মানুষই মনে করে না! কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না। তার সারা শরীর রাগে কাঁপছে। গাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তা খেয়াল করেন। তবে তিনিও কিছু বলেন না। শুধু এক টুকরো হাসির ঢেউ চোখে-মুখে ছড়িয়ে দিয়ে লস্করের সাথে তার গাড়ির বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। রশিদ টলতে টলতে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরেন। কিন্তু পা চলে না। তার মনের ওপর দিয়ে যেন এক বিরাট ঝড় বইছে, যার ধাক্কা সারা শরীরে এসে লাগছে। সেই ঝড়ের ধাক্কা কোনোমতে সামলে তিনি পথ চলতে থাকেন!

আজ মঙ্গলবার। রশিদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সংবাদপত্র অফিসের নিয়ম একটু অন্য রকম– সবাই একই দিন ছুটি নিতে পারে না, পালাক্রমে ছুটি নিতে হয়। সেই নিয়মেই রশিদের ছুটি মঙ্গলবার। এদিনে তিনি বাজার করতে কাঁঠালবাগান বাজারে যান। কাওরান বাজারেও যান কখনো-সখনো। পছন্দমতো সদাইপাতি কেনেন। তারপর বিকেল পর্যন্ত মেয়ে দুটোর সাথে নানান বিষয়ে গল্প করেন। সন্ধ্যায় যান প্রেসক্লাবে। এই তার প্রতি মঙ্গলবারের রুটিন।

আজকের ছুটির দিনেও তিনি এসেছেন কাঁঠালবাগান বাজারে। পশ্চিম পাশ দিয়ে কেবল কাঁচাবাজারের সামনে গিয়েছেন, অমনি দেখেন নাজমুলকে। উত্তর দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে এ-দিকেই আসছে সে। নাজমুলকে দেখে রশিদ খুব খুশি হন। জোরে ডাক দেন– এই নাজমুল! নাজমুল! রশিদকে দেখে নাজমুলও খুশি হয়। প্রায় দশ-বারো দিন ওর সাথে দেখা নেই রশিদ পারভেজের। লস্করের ওপর রাগ করে ওই পথে আর অফিসে যান না রশিদ– রাস্তার উলটো পাশ দিয়েই যান। দূর থেকে তাকিয়েও নাজমুলকে তিনি দেখতে পাননি। ওকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছিল তার। আজ নাজমুলকে দেখে তাই তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করেন– কেমন আছ নাজমুল? তা, তোমার চাকরি কেমন চলছে?

ভালো আছি ছার। বাজার করতে আইছি। তা, আপনে কেমন আছেন? আপনে সেইদিন ওস্তাদরে কী কী নাকি জিগাইছিলেন, তাতে সে আমার উপর খাপ্পা হইয়া পরের দিনই আমার চাকরিডা নট কইরা দিছে। তয় রাখে আল্লায় মারে কে! আমিও কম বান্দা না ছার। এরিমধ্যে আরেকটা চাকরি যোগাড় কইরা ফেলাইছি ছার, বাংলামোটরে এক গ্যারেজে। রোজ তিন শ' টাহা। মঙ্গলবার ছুটি। মালিকও ভালো। আগেরডার মতন না। দোয়া কইরেন ছ্যার, এক দিন যেন গ্যারেজের কামের ফাঁকে পড়ালেখা করে নিজেই একখান গ্যারেজ দিতে পারি।

–বাসায় আর কে কে আছে তোমার?– রশিদ জিজ্ঞেস করেন।

–বাবা, মা আর দুডো বইন। বইন দুইডা ছোডো। মা বাসা-বাড়িতে ছুটা কাম করে। কাঁঠালবাগান বাজারের উত্তর দিকের এক বস্তিতে আমাগো বাসা, মানে কোনো রহমে থাকা যায়, এমন বাসা। তবে বেশি দিন এমন থাকুম না। ভালোভাবে কাজ শিখ্যা যহন নিজেই মিস্তিরি হমু, তহন মালিক আমার বেতন আরো তিন শ' টাহা বাড়াইয়া দিব,

কইছে। তহন এট্টু ভালো বাসা ভাড়া নিমু আর...

নাজমুলকে থামিয়ে দিয়ে রশিদ জিজ্ঞেস করেন– আর তোমার বাবা? তিনি আয় করেন না?

–তাই তো কইতে চাইছিলাম ছার। আমার বাবা আগে রিশকা চালাইত। নিজেরই রিশকা। গাঁয়ে সামান্য এট্টু জমি ছিল, তাই বেইচ্যা একখান রিশকা কিনছিল। ঝকঝকে নতুন। রোজগার ভালোই হইতো। আমিও ইশকুলে পড়তাম। কিন্তু কপালে সইল না স্যার। বছরখানিক পর এক ট্রাকের চাপায় রিশকা শেষ। বাবা কোনোমতে বাইচ্যা গেলেও তার দুডো পা-ই পঙ্গু অইয়া গেল। মাও ঝিয়ের কাম নিল বাসাবাড়িতে। একটা ট্রাকের ধাক্কায় আমাগো সবকিছু শেষ অইয়া গেছে ছার...

কান্নায় নাজমুলের গলা আটকে যায়। রশিদ তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবেন, ভেবে পান না। একটু পর নাজমুলই প্রথম মুখ খোলে– তয় এই নাজমুল কিন্তু হারার বান্দা না, ছার। আবারো পড়ালেখা শুরু কইরা দিছি। বাসার এট্টু দূরে এট্টা নাইট ইশকুল আছে। ওইখানে ক্লাস ফোরে ভর্তি হইছি। এরপর হাই ইশকুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব জায়গাতেই পড়ুম ছার। জীবনডারে সহজে ভাগ্যের হাতে ছাইড়া দিমু না। একদিন গ্যারেজের মালিক হমু ঠিকই, তয় ইদ্রিস লস্করের মতো অশিক্ষিত গ্যারেজ মালিক হমু না। দোয়া কইরেন ছার।

আজকের এই নাজমুলকে বড্ড অচেনা মনে হয় সাংবাদিক রশিদ পারভেজের কাছে। সেই ভীতু মুখচোরা ছেলেটির কোনো ছায়া নেই এখানে। এ যেন এক নতুন মানুষ। চোখে-মুখে আশার আলো চিকচিক করে। রশিদের চোখেও এক নতুন আলোর ঝিলিক। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন– আকাশের সিঁড়ি বেয়ে নাজমুল এবং তার মতো অগণিত শিশু-কিশোর স্বপ্নের পাখায় ভর করে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে... কেবলই উঠছে... উঠছেই... ■

শ্রমজীবী

সালাম ফারুক

দেহের রক্ত পানি করে
যারা গড়ে অর্থনীতি
তারা তো কেউ তুচ্ছ নারে
তাদের তরে রাখো প্রীতি।

এই যে তুমি ঘুমাও রাতে
খুব আরামে সুখে থাকো
এসব বড়ো দালান ওঠে
তাদেরই ঘামে জেনে রাখো।

ওরা যে সব শ্রমজীবী
শক্ত হাতে শিল্প গড়ে
মাথার ঘামে পা যে ভেজে
দিনে রাতে রোদ কি ঝড়ে।

নিবন্ধ

অলক প্রেমী নজরুল

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্য ও সংগীতে কিংবদন্তি। তাঁর বাণী ও সুরের মাধুর্যে সংগীত বৈচিত্র্যময়। কাজী নজরুল ইসলাম সংগীত রচনার পাশাপাশি সুরকার, স্বরলিপিকার, সংগীত শিল্পী, সংগীত পরিচালক, রাগস্রষ্টা এবং তালস্রষ্টা হিসেবে অতুলনীয়। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের গান রচনা করেন। যেমন : দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী (উদ্দীপনামূলক) গান, প্রেম ও প্রকৃতির গান, ইসলামি গান ও ভক্তিগীতি (শ্যামা, ভজন ও কীর্তন), পল্লিগান, গজল প্রভৃতি। নজরুল রচিত সংগীতগুলোতে যেমনি করে সৃষ্টিশীল আবেগের অপূর্ব বাণীমূর্তি প্রকাশ পায়, তেমনি করে প্রকাশ পায় সুরমূর্তি। এই স্বল্প পরিসরের লেখনীতে নজরুলের গজল পর্যায়ের একটি গান নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি-

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা অনেক গজল আছে, তার মধ্যে একটি হলো-

আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন দিল ওহি মেরা ফঁস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায় আব্ধা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি ॥
তোমার কেশের গন্ধ কখন,
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুঁশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ মে বাজু বন্দ মে বস্ গয়ি ॥
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ্, ফিরাদিয়া চোরী কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া আউর নেহিঁ উয়েঅ
ওয়াপস্ গয়ি ॥'

নজরুল তাঁর রচিত গজলে নানা রকম রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন। তাই আরবি, ফারসির ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। আরবি ও ফারসি শব্দের প্রয়োগ মানব চিত্তে এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। ফলে নজরুলের গজলগুলো সংগীত ভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বল। বাংলা সংগীতে নজরুলের গজল গান সম্পর্কে একটা প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

নজরুল গজল গানের স্রষ্টা এবং সফল প্রবর্তক। এ ধারাটি সম্পূর্ণ তাঁরই অবদানে পুষ্ট। তাঁর পূর্বে, অতুল প্রসাদের গানে গজলের কিছু গুঞ্জরণ শোনা গেলেও, সেগুলো সার্থক হয়ে ওঠেনি। সেগুলোতে বাংলা ছলনা এবং সংগীত রসলিপ্সু বাঙালি মনের কোনো ছাপ পড়েনি।

গজলের আদি নিবাস পারস্যে। পারস্যের প্রেম সংগীত রূপায়ণের জন্যই গজলের জন্ম। গজলের মোটামুটি দুটি অংশ- আস্‌হায়ী এবং অন্তরা। আস্‌হায়ী অংশটা সুর এবং তালসহ যোগে গাওয়া হয় এবং অন্তরা অংশটি তালছাড়া সুরের টান রেখে আবৃত্তির ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হয়, এই অংশ কেবল হয় শের বা শেয়র। বিলম্বিত লয়ে অন্তরার এই অংশটির সুরবদ্ধ আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্র যখন আস্‌হায়ীতে ফেরা হয় তখন হঠাৎ সুর ও তালের ছন্দোবদ্ধ যোজনায় একটি অপূর্ব সংগীতের আমেজ ও স্ফূর্তির প্রকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য সাধারণ গানে এটি হয় না। গজলের গায়ক, বাদ্যকারগণ এবং শ্রোতাবৃন্দ এই সংগীত মূর্চ্ছনার মুহূর্তটুকুর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। শের অংশ অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্য সমৃদ্ধ - এই অংশের কাব্যগুণ শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। অন্তরা থেকে আস্‌হায়ীতে ফেরার সময় সংগীতকারের নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ ঘটে। এ অনেকটা ঠুংরীর মুখ পাতের অংশ চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হওয়ার সময় ছন্দের নিপুণ কাজের মতো। তবে ঠুংরীর সঙ্গে গজলের এই অংশের তাল ক্রিয়ার প্রধান তফাৎ এই যে, ঠুংরী গাওয়া হয় সাধারণত দাদরা বা আদ্ধাতালে; আর গজল গাওয়া হয় প্রায়শ। সাধারণত কাহার বাতালে।

উল্লেখ্য গানটি প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

গ্রন্থ : বন গীতি

শ্রেণী - গজল

বি.দ্র. : গানটির প্রামাণ্য সুর পাওয়া যায়নি। প্রচলিত স্বরলিপির সুর পরবর্তী কালে বানানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র : ব্রহ্মমোহনঠাকুর: নজরুল সংগীত নির্দেশিকা, পৃ.৭৮।

সামঞ্জস্য শব্দের গাঁথুনীতে গজল সংগীতটি প্রাণবন্ত হয়েছে। নজরুল সংগীতগুলো তাঁর আত্ম উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রচিত সংগীতের আবেদন চিরদিন অম্লান থাকবে।

তথ্যঋণ:

০১. কাজী নজরুল ইসলাম : শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি, স্বরলিপি : নিতাই ঘটক, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: আবদুল আজীজ আল আমান, পরিমার্জিত শতবার্ষিকী সংস্করণ শুক্রবার ২০ এপ্রিল, ২০০৭, প্রকাশক, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

০২. কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল-সংগীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬, প্রকাশক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

০৩. ব্রহ্মমোহনঠাকুর : নজরুল সংগীত নির্দেশিকা, প্রথম সংস্করণ, ২৫ মে ২০০৯, প্রকাশক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। ■

গুগল-ডুডলে কবি নজরুল

মারুফা খানম

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১ তম জন্মদিন পালিত হয় ২৫শে মে। এবারের জন্মদিনে গুগলের হোমপেজে এ বিশেষ ডুডলে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের হোমপেজ ডুডলে দেখা যায় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। বাংলা ভাষার কিংবদন্তি এ কবির ১২১তম জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানিয়ে গুগলের এ ডুডল প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গুগলে গেলে (www.google.com) চোখে পড়েছে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে করা ডুডলটি। এতে গুগলের বিভিন্ন অক্ষরগুলোকে সাজানো হয়েছে বিশেষভাবে। যেখানে দেখা মিলে নজরুলের হাতে থাকা একটি খাতা থেকে তাঁর লেখাগুলো উড়ে গিয়ে গুগলের লোগো তৈরি করছে। সাদা টুপি, চোখে চশমা আর বাবরি দোলানো চুলেও দেখোনো হয়েছে প্রিয় এ কবিকে।

গুগল তাদের ডুডল পেজে লিখেছে, আজকের ডুডলে বাঙালি কবি, সংগীতকার, লেখক কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করা হচ্ছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিল নজরুলের কণ্ঠ। তিনি সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার পক্ষে যেমন বলেছেন, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিলেন, যা তাঁকে বিদ্রোহী কবির খেতাব এনে দিয়েছে।

১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলায় আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি নজরুল। ছোটবেলা থেকেই কবিতা ও সাহিত্যে তাঁর ঝোঁক ছিল। ১৯২২ সালে তাঁর বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়, যা উপনিবেশবাদ এবং বিশ্বব্যাপী নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানকে তুলে ধরে। আজকের ডুডল শিল্পকর্মটি তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করা হয়েছে।

বিশেষ দিন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে অনেকদিন থেকে গুগল সার্চের মূল পাতায় ডুডল প্রকাশ করে আসছে গুগল। আগেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রখ্যাত স্থপতি ও পুরোকৌশলী এফ আর খান, জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিনসহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিনে ডুডল প্রকাশ করেছে গুগল। ■

বঙ্গবন্ধুর
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

বঙ্গবন্ধু—স্বাধীনতার ছবি

বাতেন বাহার

কথা কাজে তুখোড় নেতা
আর কে বলো বঙ্গবন্ধুর মতো?
যার ভাষণে বাঙালি এক
বীরের জাতি, করেনি মাথা নত।
যার কবিতা সবার সেরা,
পদ্মা-মেঘনা আর যমুনার বাঁক
সাতই মার্চের সেরা ভাষণ,
ভাষণ তো নয়, 'হায়দরী' সে হাঁক।
সেরা কালের সেরা নায়ক,
সেরার সেরা মা ও মাটির কবি
তিনি মায়ের শ্রেষ্ঠ খোকা
বঙ্গবন্ধু– স্বাধীনতার ছবি।

বঙ্গবন্ধুর প্রাণ

বশিরুজ্জামান বশির

বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা
বাংলাদেশে নাই
বঙ্গবন্ধুর কাছে শিক্ষা
নিতে পারো তাই।

দেশপ্রেম আর ভালোবাসায়
বঙ্গবন্ধুর প্রাণ
জীবন দিয়ে করে গেলেন
দেশের জন্য দান।

সেই থেকে বাংলা আজও
টাপুর টুপুর চলে
বাংলাদেশটা বঙ্গবন্ধুর
বিশ্ববাসী বলে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

মেজবাউল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪০তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১৭ই মে। ১৯৮১ সালের এই দিনে ছয় বছরের নির্বাসন শেষে তিনি দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। তাঁকে বহনকারী উড়োজাহাজটি সেদিন বিকেলে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে ঢাকায় নামলে বিমানবন্দরে লাখো মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নর ঘাতকরা ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এসময় বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। এ হত্যাকাণ্ডের পর বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। ঠিক এমনি ক্রান্তিলগ্নে ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন শেখ হাসিনা। সেদিন রাজধানী ঢাকা মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা শহর মিছিল আর স্লোগানে প্রকম্পিত হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর ঝড়-বৃষ্টি লাখ লাখ মানুষের মিছিলের গতিরোধ করতে পারেনি সেদিন। কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলা নগর পরিণত হয় জনসমুদ্রে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখতে সেদিন

সারা বাংলাদেশের মানুষের গন্তব্য ছিল রাজধানী ঢাকা। স্বাধীনতার অমর স্লোগান 'জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় বাংলার আকাশ-বাতাস।

এ সময় শেরেবাংলা নগরে আয়োজিত সমাবেশে লাখো জনতার সংবর্ধনায় শেখ হাসিনা বলেন- 'আমার আর হারাবার কিছুই নেই। পিতা-মাতা, ভাই রাসেল সবাইকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি আপনাদের মাঝেই তাদেরকে ফিরে পেতে চাই। আপনাদের নিয়েই আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই, বাঙালি জাতির আর্থসামাজিক তথা সার্বিক মুক্তি ছিনিয়ে আনতে চাই।'

প্রতি বছর ১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সারাদেশে নানা কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু এ বছর বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে সৃষ্ট সংকটে শেখ হাসিনার নির্দেশে সব ধরনের জনসমাগমপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিহার করেছে আওয়ামী লীগ। ঘরে বসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশবাসীকে শেখ হাসিনার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনায় পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। ■

আমাদের করোনা যোদ্ধারা

নুসরাত জাহান

করোনা ভাইরাসে নাস্তানাবুদ এখন পুরো বিশ্ব। আমাদের দেশেও করোনা ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে। তবে আমাদের দেশের শক্তিশালী যোদ্ধাদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় আমরা এই করোনাকে জয় করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

করোনাকালে আমাদের দেশের যে-সকল যোদ্ধারা সবচেয়ে বেশি সাহসী ভূমিকা রাখছেন তাঁরা হচ্ছেন, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, সরকারি কর্মচারীসহ ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাধারণ মানুষও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন। জীবন বাজী রেখে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন করোনা যোদ্ধারা। করোনাকালীন এই কাজের পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা মানুষের সেবায় এই পরিবেশেই কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সরকার ডাক্তার, নার্স, পুলিশসহ সকলের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছে। ফলে সকলে যার যার অবস্থান থেকে সেবা প্রদান করতে পারছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে লড়ে যাচ্ছেন সে জন্য তাদের প্রতি আমরা অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও কিছু রোগীর মৃত্যু দেখে স্বাস্থ্যকর্মীরা যথেষ্ট মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন। এছাড়া নিজেই ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ভয় তো রয়েছেই। তাদের মাধ্যমে ভাইরাসটি তাদের পরিবারের মধ্যেও পৌঁছে যেতে পারে। করোনা ভাইরাসে সংক্রমণের ভয় সত্ত্বেও কিছু সেচ্ছাসেবী সংগঠন করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের লাশ দাফনের দায়িত্ব নিয়েছেন। যা সত্যিই একটি প্রশংসনীয় মানবিক উদ্যোগ। করোনায় পুলিশ বিভাগের লক্ষ্য শত বিপদের মধ্যেও জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করে যাওয়া। অনেক পুলিশ সদস্য করোনায় সংক্রমিত হলেও আশার কথা যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে আবার কাজে ফিরে যাচ্ছেন।

এছাড়া অন্যরাও এখন ভয়কে জয় করে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে রোগীর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। চিকিৎসা কর্মী, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের বীরত্ব এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে যে, আমরা এই ভাইরাসকে অবিলম্বে মোকাবিলা করতে পারব।

যে-কোনো মৃত্যুই বেদনার। আমাদের একটি সামগ্রিক সংকল্প দরকার যে, আমরা আমাদের ১ম সারির যোদ্ধাদের রোগী হয়ে যেতে দেব না। এ জন্য নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। তবেই আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে পারব। সুতরাং কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে সকল করোনা যোদ্ধাদের জন্য রইল আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। জয় হোক করোনাকালীন যোদ্ধাদের, জয় হোক সবার। ■

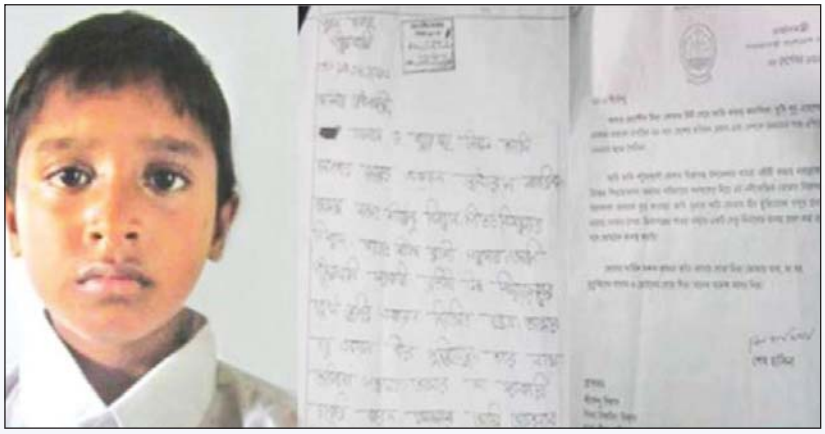

শীর্ষেন্দুর স্বপ্নপূরণ

রাইসা রহমান

সেই ২০১৬ সালের কথা। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস। খরস্রোতা পায়রা নদীতে সেতু চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি লিখেছিল। প্রধানমন্ত্রী সেই চিঠির জবাবও দেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেতু নির্মাণ করা হবে। ২০২০ সালে শীর্ষেন্দুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।

পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর উপর এক হাজার ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কের ১৭ কিলোমিটারের পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ' প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূরণ হবে শীর্ষেন্দুর ইচ্ছে। ১০ই মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস বাবা-মায়ের চাকরির সুবাদে পটুয়াখালী শহরে বসবাস করে। তাদের বাড়ি ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার আওরাবুনিয়া ইউনিয়নের ছয়আনি গ্রামে। গ্রামের বাড়ি থেকে পটুয়াখালী জেলা শহরে যেতে জেলার মির্জাগঞ্জের পায়রা নদী পার হতে হয়। এ নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। মানুষ ভয় পায়। তাই ওই নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে চিঠি লেখেন শীর্ষেন্দু।

প্রধানমন্ত্রী শীর্ষেন্দুর চিঠির উত্তরে সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন শীর্ষেন্দুকে। সেই চিঠি তার স্কুলে পৌঁছে ২০শে সেপ্টেম্বর। ২৬শে সেপ্টেম্বর সেই চিঠি স্কুল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে শীর্ষেন্দুর হাতে তুলে দেয়।

সড়ক বিভাগ সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত সেতু হবে দুই লেনবিশিষ্ট। দৈর্ঘ্য মূল সেতু ১৩৭৫ মিটার এবং ডায়াডাক্ট উভয় প্রান্তে ৩৪১ দশমিক ৪৪ মিটার। সেতুর প্রস্থ ফুটপাতসহ ১০ দশমিক ৭৬ মিটার। ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স (জাহাজ চলাচলে যে উচ্চতা রাখা) ১৮ দশমিক ৩০ মিটার (ক শ্রেণি বিবেচনায়) এবং হরিজেন্ট্যাল ক্লিয়ারেন্স (দুই স্প্যানের মধ্যবর্তী প্রশস্ততা) ৯০ মিটার। প্রকল্পের আওতায় এক হাজার ৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতুর উভয় পাশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে ৬০০ মিটার। সেতু (ভায়াডাক্টসহ) নির্মাণ করা হবে ১ হাজার ৬৯০ মিটার। গাইড বাঁধ নির্মাণ করা হবে ১ হাজার মিটার। এজন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে ৮ দশমিক ৫ একর। সেতুর টোল প্লাজা নির্মাণসহ কম্পিউটারাইজড টোল আদায় পদ্ধতি চালু করা হবে ৬টি। ওজন স্টেশন স্থাপন করা হবে দুটি। থাকবে টোল মনিটরিং ভবন, পুলিশ স্টেশন এবং প্রকল্পের জনবলের জন্য আবাসিক ভবন।

দীর্ঘ সেতু নির্মাণের মাধ্যমে মির্জাগঞ্জ উপজেলার সঙ্গে পটুয়াখালী সদর এবং ঢাকার সরাসরি, নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। মার্চ ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদেই শীর্ষেন্দুর ইচ্ছা পূরণ করা হবে। ■

মায়ের ভালোবাসা

শাহানা আফরোজ

ছোট্ট শব্দ মা পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম শব্দ কণিকা। মায়া-মমতায় মধুমাখা। নিখাদ এ ডাক ভালোবাসায় অকৃত্রিম, বুক ঝিম করা প্রতিদানহীন। কোনো উপমা, সংজ্ঞায় এর ভালোবাসার পরিধি আকার, আয়তন ও গভীরতাকে আজো ছুঁতে পারেনি। মা উচ্চারণের সাথে সাথে হৃদয়ের অতল গহীনে যে আবেগ ও অনুভূতি রচিত হয়, তাতে অনাবিল সুখের আবেশ নেমে আসে। প্রতিক্ষণ-প্রতিদিন নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সন্তানদের পৃথিবীতে চলার যোগ্য হিসেবে তৈরি করে দেন মা। এ ঋণ শোধ করার নয়। পৃথিবীর সব দেশেই মা শব্দটিই কেবল সর্বজনীন। মা হচ্ছেন মমতা-নিরাপত্তা-অস্তিত্ব, নিশ্চয়তা ও আশ্রয়। মা সন্তানের অভিভাবক, পরিচালক, ফিলোসফার, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও বড়ো বন্ধু।

মায়ের দেহে নিউট্রোপেট্রিক রাসায়নিক পদার্থ থাকায় মায়ের মনের মাঝে সন্তানের জন্য মমতা জন্ম নেয়, মায়ের ভালোবাসার ক্ষমতা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সব ধর্মে মায়ের মর্যাদা সৃষ্টিকর্তার পরেই। মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মুহূর্তের। আমরা সবাই মা কে ভালোবাসি। তবুও বিশেষ একটি দিন, কিছু মুহূর্ত মাকে উপহার দেয়ার জন্য পালন করা হয় বিশ্ব মা দিবস। যদিও মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ মে মাসের ২য় রোববার পালন করে মা দিবস। ইতিহাসের পাতা উলটে মা দিবস কীভাবে এল এসো জেনে নেই-

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান জার্ভিস ও তার মেয়ে আনা মারিয়া রিভস জার্ভিসের উদ্যোগে প্রথম মা দিবস পালিত হয়। আনা জার্ভিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর ও ওহাইওর মাঝামাঝি ওয়েবস্টার জংশন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তার মা অ্যান মেরি রিভস জার্ভিস সারা জীবন অনাথদের সেবায় জীবন ব্যয় করেছেন। ১৯০৫ সালে মারা যান মেরি। অনাথদের জন্য মেরির এই নিঃস্বার্থ উৎসর্গিত জীবনের কথা অজানাই থেকে

যায়। লোকচক্ষুর অগোচরে কাজ করা মেরিকে সম্মান দিতে চাইলেন মেয়ে আনা জার্ভিস। তাই নতুন এক উদ্যোগ নেন। ওই বছর তিনি তার সান ডে স্কুলে একটি দিন মাতৃদিবস হিসেবে পালন করেন। ১৯০৭ সালের এক রোববার আনা মারিয়া স্কুলের বক্তব্যে মায়ের জন্য একটি দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এরপর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সব মাকে স্বীকৃতি দিতে আনা জার্ভিস প্রচার শুরু করেন। তার সাত বছরের চেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় মা দিবস। ১৯১১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে মা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯১৪ সালের ৮ মে মার্কিন কংগ্রেস মে মাসের দ্বিতীয় রোববারকে মা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

মা তার সন্তানকে ভালোবাসবে এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। কিন্তু মা তার স্নেহের আঁচলে শুধু নিজ সন্তান নয়, যে-কোনো সন্তানকে ঠাঁই দেয়। ভালোবাসা দেয়, উজার করে। এমনকি নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। কখনো এই মা হারিয়ে যাওয়া কোনো সন্তানকে বুকে টেনে নেয়, কখনো নিজ গোত্রের বাহিরে অথবা কোনো শত্রুর সন্তানকে মমতার চাদরে ঢেকে দেয়। কখনো বা শুধু মা ডাক শুনেই মাতৃত্বের সাধ নেয়। মা তো মা-ই। ছোট্ট বন্ধুরা, বিশ্ব মা দিবসে তোমাদের ব্যাতিক্রমী কিছু মায়ের কথা জানাব।

অন্যরকম মাতৃত্ব

কলকাতার বর্ধমানের বোরহাটের তৃপ্তি চক্রবর্তী। বয়স ৮০ ছুঁই ছুঁই। মায়া-মমতায় মোড়া এই নারী মা হননি। কিন্তু তাঁর সন্ততির সংখ্যা শতাধিক। লালন পালন করছেন প্রায় ৫০ টি কুকুর আর প্রচুর বিড়াল। কয়েকটি হনুমানও রয়েছে তাঁর পরিবারে। সফেদ, পুলি, পার্ক, ভিম, নকুল–এক এক জনের এক এক রকম নাম। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। তৃপ্তি দেবীর এদের নিয়েই সুখি সংসার। সন্তান স্নেহে যেমন পশুদের দেখেন পশুরাও মায়ের মতো ভালোবাসে। ওই সব অজ্ঞাত কুকুর-বেড়ালদের থাকার জন্য নিজের আস্ত বাড়িটাই দান করেছেন। রাস্তায় আহত পশুদের

সুস্থ করে কখনও তার জায়গায় ফিরিয়ে দেন, আবার কেউ যেতে না চাইলে নিজের বাড়িতেই রেখে দেন। এভাবেই একটা দুটো করে বাড়তে বাড়তে আজ তার সংখ্যা ৫০। বয়সের ভারে শারীরিক ক্ষমতা অনেকটাই কমেছে। নিজের পরিচর্যার জন্য কোনো পরিচারিকা না রাখলেও তার পোষ্য সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিজের পেনশনের টাকা খরচ করে ২ জন কর্মী রেখেছেন। তাঁর অবর্তমানে পোষ্য সন্তানদের কেউ যাতে উৎখাত না করতে পারে তাই নিজের বসতভিটাটা আইনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদের নামে। দান করেছেন সঞ্চিত অর্থও। তার অবর্তমানে এদের দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। বয়সকে হার মানিয়ে মাতৃস্নেহে লালন পালন করছেন তার সন্তানদের। তৃপ্তি দেবী এক অনন্য মায়ের বিরল দৃষ্টান্ত।

উজাড় মাতৃত্ব

বাঘ-সিংহের প্রিয় খাবার হরিণ। কিন্তু সেই হিংস্র প্রাণীর কাছে কাছেই বেড়ে উঠছে একটি হরিণ শাবক। মাতৃস্নেহের এমন বিরল ঘটনার ছবি ধরা পড়েছে নামিবিয়ার ইতোশা ন্যাশনাল পার্কে। এক সিংহী সেখানে মাতৃস্নেহে লালন পালন করছে একটি হরিণ ছানাকে। তথ্যসূত্রে জানা গেছে, সিংহীর নিজের শাবক ছিল। সেই শাবকদের মেরে ফেলেছে আরেকটি পুরুষ সিংহ। সন্তানহারা হয়ে সিংহী তার মাতৃত্ব উজাড় করে দিয়েছে হরিণ ছানার উপর। তাকে নিয়ে খেলছে, শরীর পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এমনকি নিজের জীবন বাজি

রেখে এই মা সিংহী হরিণ ছানাকে বাঁচিয়েছে অন্য সিংহীদের হাত থেকেও। ওরা খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। হরিণ শাবকটিকে দেখে তাকে খাবে বলে এগিয়ে আসতেই সিংহী মা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিংহীটি যখন হরিণ শাবকটিকে নিজের থাবার মধ্যে নিয়ে আদর করে তখন মনে হয় 'ভোজের প্রস্তুতি'। কিন্তু এমন কিছুই ঘটে না। বরং, অন্যান্য সিংহীদের আক্রমণ থেকে হরিণ শাবকটিকে আগলে রাখে সিংহীটি। এমন মায়ের কোনো তুলনা নেই।

দুধ মা

কুকুর-বিড়ালের শত্রুতা জানা রয়েছে সবারই। তবুও প্রকৃতির নিয়মে মা হারা এক বিড়াল ছানাকে মাতৃস্নেহ ও দুধ খাইয়ে বড়ো করছে একটি কুকুর। গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের বড়ো জামালপুর গ্রামে এমন চিত্র দেখা গেছে। মা হারা

একটি বিড়াল ছানাকে দুধ খাওয়াচেছ একটি কুকুর। যেন মায়া-মমতা সব কিছু দিয়েই আঁকড়ে ধরে রেখেছে কুকুরটি। বিড়াল ছানাটিও পরম আগ্রহে কুকুরের দুধ পান করছে অনায়াসে।

গরুর মাতৃস্নেহ

আধপাকা একটি গোয়াল ঘড়ের এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একটি গাভী। আর তার দুধ পান করছে একটি বাছুর ও চারটি ছাগল ছানা। একই প্রজাতির না হয়েও একটি গরুর মাতৃস্নেহ বিলিয়ে দেওয়ার বিরল এ ঘটনা দেখা গেছে দিনাজপুরের হিলির বিশাপাড়া গ্রামে।

ওই গাভী ও ছাগল ছানার মালিক ইনছান আলী বলেন, আমাদের গাভীটি একটি বাছুর দেয়। এর পরের দিন বাসার ছাগলও বাচ্চা দেয় ৪টি। গরু-বাছুর ও ছাগল ছানাদের একই গোয়ালে একইসঙ্গে রাখা হয়। সংখ্যায় বেশি হওয়ায় ছানাগুলো

ঠিকঠাক মায়ের দুধ পাচ্ছিল না। প্রথম দিন দুধ কিনে এনে ছাগল ছানাগুলোকে খাওয়ানো হয়। কিন্তু পরের দিন থেকে আর তার দরকার হয়নি।'

বাছুরের দেখাদেখি গাভীর দুধ খেতে শুরু করে ছাগল ছানাগুলো। ছাগল ছানাগুলোকে গরুর দুধ খাওয়াতে কিছুই করতে হয় না। নিজ সন্তানের মতো পরম মমতায় গাভীটি ছাগল ছানাদের দুধ খাওয়ায়।'

প্রাণিসম্পদ অফিসার বলেন,'মায়ের শরীর থেকে প্রয়োজনীয় দুধ বা পুষ্টি না পেলে ছাগল ছানা গাভীর দুধ খেতে পারে। এটা একেবারে নতুন নয়। প্রাণিকুলে এমনটা দেখা যায়। তবে এটা সচরাচর ঘটে না।'

বিরল মাতৃস্নেহ

সমাজের মানুষগুলো যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, নিজের স্বার্থ ছাড়া কেউ কিছুই করতে চায় না, তখন বিরল প্রেম দেখা যায় প্রাণীদের মধ্যে। কতগুলো কুকুর ছানাকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে একটি মুরগি। এই বিরল ঘটনাটি ঘটেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবাগান এলাকার বড়ো বাড়িতে। এ বাড়ির বড়ো ছেলে সাজিদ হাসান বলেন কুকুর, মুরগি দুটোই আমাদের পোষা। কিছুদিন হলো কুকুরের ছানাগুলো হয়েছে। কুকুরটি যখন খাবারের খোঁজে চলে যায় তখন মুরগিটি এসে কুকুরের ছানাগুলোকে মাতৃস্নেহে আগলে রাখে। সত্যি বিরল এমন মাতৃস্নেহ।

মায়ের ভালোবাসার বিকল্প নেই

মায়ের ভালবাসা পৃথিবীর সেরা সম্পদ। সে মানুষই হোক বা পশু। এমনই এক ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। একটি বাঁদর ছানাকে পরম স্নেহে লালন পালন করছে একটি কুকুর। সব সময়েই মা কুকুর এই ছোটো বাঁদর ছানাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখে ও পরম স্নেহে লালনপালন করে। বাঁদরছানাটি রাস্তা ভুলে লোকালয়ে চলে আসে। তখন থেকে পরম স্নেহে কুকুরের কাছে লালিত পালিত হচ্ছে।

এতিম সন্তান

কুকুর সবচেয়ে প্রভুভক্ত। সেই কুকুর আবার আপন করছে হাঁসছানাদের! ভাবা যায়।

ফ্রেড হলো একটি ১০ বছরের লাব্রাডর কুকুর যার স্নেহ সবাইকে বিস্মিত করেছে। লন্ডনের স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরের কাছে এক পর্যটন কেন্দ্রে ৯টি বাচ্চাকে জন্ম দিয়েই মা হাঁসটি মারা যায়, তৎক্ষণাৎ ওই অনাথ বাচ্চাগুলোকে কাছে টেনে নেয় এই লাব্রাডরটি। যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে সাঁতার শেখানো সবই করছে ফ্রেড। জেরেমি গোল্ডস্মিথ, ফ্রেডের মালিক বলেছেন ১০ বছরের ফ্রেড যেখানেই যায় বাচ্চাগুলো তার পিছন পিছন ঘোরে, ঘুমালে সাথে ঘুমায়, বসে থাকলে ফ্রেডের কোলের কাছে বসে কখনো কখনো মাথায় ঘাড়ে উঠে বসে। বাচ্চাগুলো ফ্রেড-কে তাদের মা বলেই মনে করে। ■

মায়ের ভালোবাসার জন্য

সালাম হাসেমী

আগামী পরশু মা দিবস। উপমা সারারাত তার মাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে ঘুমাতে পারেনি। মা দিবস এলে তার ক্লাসের বান্ধবীরা তাদের মা'কে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ফুল কিনে মা দিবসে শুভেচ্ছা জানায়, উপহার দেয়। সালাম করে দোয়া নেয়। মায়ের হাতের রান্না করা ভালো ভালো খাবার খায়। সারাদিন তাদের মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করে। মায়ের স্নেহ-আদর ও ভালোবাসা পায়। কিন্তু তার মা কোথায়? জন্মের পর

সে যখন ভালো করে বুঝতে শিখেছে ঠিক সে সময় থেকে সে মাকে দেখেনি। বুঝ হওয়ার পর থেকে সে দেখে আসছে দাদির কাছে লালিত পালিত হচ্ছে। জন্মের পর সে মায়ের স্নেহ, আদর ভালোবাসা পায়নি। মা কি জিনিস সে বুঝে না। সে কেবল তার পাঠ্যবইতে 'মা' শব্দটি পড়েছে। এছাড়া সে তার মায়ের সম্পর্কে আর কিছু জানে না। উপমা যখন মা নিয়ে এমনি ভাবনা-চিন্তা করছিল তাদের ভাড়া করা ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠিক সে মুহূর্তে গ্রীষ্মের ভর দুপুরবেলা ডাকপিয়ন এসে সুন্দর লাল খামের একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটি সে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। পড়া শেষে বুঝতে পারল এ চিঠি তার মা লিখেছে ঢাকা থেকে। চিঠিতে দেয়া ঠিকানায় উপমাকে তার মা দেখা করতে বলেছে।

বিকেলবেলা সে দাদির সাথে বাজারে গিয়ে মাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য একটি ফুলের তোড়া ও কিছু উপহার কিনল। পরেরদিন ভোরবেলা উপমা মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য দাদির সাথে রওয়ানা হলো। ঢাকার টিকেট কেটে বাসে উঠে বসল। দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল বাস। বাসের সিটে বসে উপমা মায়ের কাছ থেকে আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা কীভাবে পাবে সে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রথমেই সে তার মাকে ফুলের তোড়া দিয়ে মা দিবসের শুভেচ্ছা জানাবে। মা তাকে মুখে চুমু দিয়ে কোলে তুলে নিবে। ভালো ভালো খাবার রান্না করে খাওয়াবে। গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দেবে। মা দিবসে সে তার মায়ের সাথে শিশুপার্কে, জাদুঘরে ঘুরে বেড়াবে। আর এই ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে চকবার, আইসক্রিম, ফুচকা, পেপসি খাবে। শিশুপার্কে গিয়ে নাগরদোলায় উঠবে। চলতে শুরু করলে নাগরদোলায় উঠে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে। মেয়ে ভয় পাচ্ছে দেখে মা তাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে সাহস দিয়ে বলবে, 'তোমার ভয় নেই মা আমি তোমার সাথে আছি না। ভয় কিসের।' সারাদিন সে মায়ের সাথে ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। বাড়ি এলে মা রাতে খাবার দিলে সে মুখে অরুচি ভাব দেখিয়ে খেতে চাইবে না। মা তখন আদর করে কোলে তুলে এটা সেটা দেখিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে। আদরে আদরে সে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়বে। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আফসোস করে মা বলবে, 'মেয়েটি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল'।

পরেরদিন জ্যৈষ্ঠের দুপুরে রোদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে খেলাধুলা করায় তার মা তাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে ঘুম পারানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ঘুম আসবে না। দুষ্টুমির ছলে ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকবে। মা ভাববে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাও তার পাশে ঘুমিয়ে পড়বে। সেই ফাঁকে সে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়ে খেলা করবে। এক সময় তার মায়ের ঘুম ভেঙে যাবে। মেয়েকে পাশে না দেখে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে মেয়েকে আমগাছ তলায় পেয়ে বলবে, 'উপমা তুমি এত দুষ্টু! ঘুমের ভান করে আমাকে দেখিয়েছ যে তুমি ঘুমিয়েছ। আর আমি ঘুমিয়ে পড়লে ঘর থেকে বেড়িয়ে দুপুরের রোদে দুষ্টুমি করছ।' একথা শেষে তাকে দিবে ধাওয়া। সেই ধাওয়া খেয়ে এদিক সেদিক দৌড়িয়ে মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরের খাটের নীচে লুকিয়ে থাকবে। তার মা তাকে অনেকক্ষণ খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে থাকবে। তখন সে খাটের নীচ হতে বেরিয়ে এসে

তার মায়ের কোলের ভিতরে বসে দু'হাত নাড়িয়ে দুলতে দুলতে বলবে, 'মা আমাকে খুঁজে পায়নি! মা আমাকে খুঁজে পায়নি!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাস গাবতলী টার্মিনালে এসে থামল। বাসের ঝাঁকুনিতে উপমার কল্পনায় ছেদ পড়ে। জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে দেখল তারা ঢাকার গাবতলী বাস স্টেশনে। এতক্ষণ উপমা মাকে নিয়ে ভাবছিল। মা যদি তার কাছে থাকত তাহলে সে মায়ের স্নেহ. আদর ও ভালোবাসা পেত। উপমা দাদির হাত ধরে বাস থেকে নেমে সিএনজি ভাড়া করে মায়ের বাসার সামনে যায়। মা চিঠিতে যে মোবাইল নাম্বার লিখেছিল সেই নাম্বারে ফোন করলে বাড়ির খালা এসে গেট খুলে দিল। উপমা ও তার দাদিকে দোতলায় নিয়ে উত্তর পাশের ফ্লোরে বসাল। উপমা রুমের ভিতরে গিয়ে দেখল বিছানার কোনায় একজন বসে আছে। উপমা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেও পলকহীন দৃষ্টিতে উপমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে। কেউ কারো দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে সরাচ্ছে না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর উপমা বলল, 'তুমি কি আমার মা? 'হ্যাঁ, আমি তোমার মা।' আমার বুকে আসো। উপমাকে কোলে তুলে নিল। উপমা মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। উপমার মা তাকে ডায়নিং রুমে নিয়ে টেবিলে খাবার দিল। খাবার খেয়ে উপমা মায়ের পাশে বসল। এক সময় উপমা মাকে প্রশ্ন করল,

মা এতদিন তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় ছিলে? কেনই বা ছিলে ?

মা উপমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর যখন দেখলাম জীবন আর চলে না তখন আমার এক ভাই আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। এতদিন আমি সেখানে কাজ করে তোমার জন্য কিছু সম্পদ গড়েছি। যাতে তোমার ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। তুমি এখানে পড়াশোনা কর। তারপর আমি আমার কাছে নিয়ে যাব। তোমাকে দেখার প্রবল ইচ্ছে হওয়ায় এবং কিছুদিন তোমার সঙ্গে থাকার জন্য আমি বাংলাদেশে এসেছি।

এভাবে উপমা এক মাস পর্যন্ত তার মায়ের কাছে ছিল। মায়ের কাছে থাকা সময়টা উপমার কাছে মনে হয়েছে যেন সুখের স্বর্গে আছে। এক মাস পার হয়ে যাওয়ার শেষ দিন সকালে উপমার মা বলল, আজ আমি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে

মা

লামিয়া হোসেন

মা কথাটি অতি মধুর
ডাকতে লাগে ভালো
মা যে আমার ভালোবাসার
দুই নয়নের আলো।
মায়ের আদর পেলে আমি
সব যে ভুলে যাই
মা ছাড়া অতি আপন
এই দুনিয়াতে নাই।

৭ম শ্রেণি, সানরাইজ কিন্ডারগার্টেন, গাজীপুর।

যাচ্ছি। উপমা বেশ অনেকক্ষণ তার মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, ‘‘মা! আমি আজ থেকে তোমার ভালোবাসার দখলে থাকতে চাই। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। মা তখন উপমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ওখানে রাতদিন পরিশ্রম করছি শুধু তোমার জন্য। তুমি পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হবে। এখন তোমাকে নিলে আমার কাজের সমস্যা হবে। তাছাড়া তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হলে অনেক কাগজপত্রও লাগবে। তাই তুমি এখানে দাদির কাছে থেকে লেখাপড়া কর, বড়ো হও তারপর তুমি আমার কাছে আসবে। তোমার প্রতি আমার অনন্তকালের আদর স্নেহ ও ভালোবাসা রইল। এ ভালোবাসা আদান-প্রদান হবে অন্তরে অন্তরে। আমরা অন্তরের কল্পলোকে একে অপরকে দেখতে পাবো। কাছে আসবো। সেইক্ষণে আমাদের আদর স্নেহ ও ভালোবাসা বিনিময় হবে। তাছাড়া একটি মোবাইল তোমার কাছে রেখে গেলাম। মোবাইলে আমরা এক অপরকে দেখতে পাব। এ কথা বলে উপমার মা তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে তাকে কয়েকটি চুমু দিয়ে বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠল। উপমা তার মায়ের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ মাকে দেখা যায়। ■

বাইরে থেকে ফিরে করোনা সংক্রমণ বিষয়ে সতর্কতা

পরিধানের কাপড় পরিবর্তন করুন ও ধুয়ে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট একটি ঝুড়িতে রাখুন

বাইরে থেকে কোনো কিছু নিয়ে আসলে তা ব্লিচযুক্ত পানি ছিটিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন

পরিহিত জুতা খুলে বাসার বাইরে জুতার বাক্সে রাখুন

বাসায় প্রবেশের পর কোনো কিছু হাত ধোয়া ছাড়া স্পর্শ করবেন না

বাইরে থেকে এসে গোসল করুন। সম্ভব না হলে শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন

পোষা প্রাণীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলে তাকে ভালোভাবে গোসল করাতে হবে

গল্প

মুক্ত ডানার পাখি

খন্দকার নূর হোসাইন

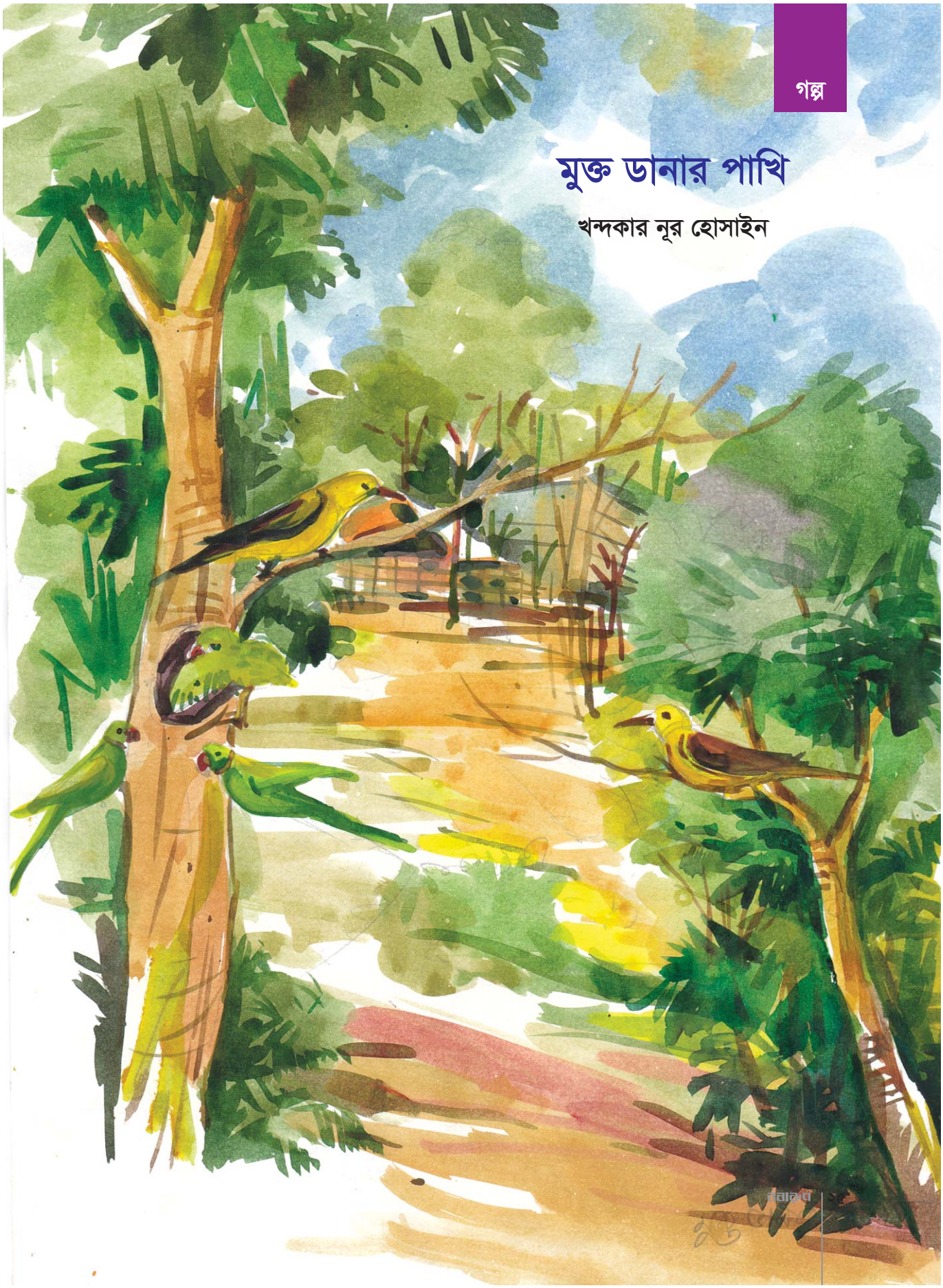

গতকাল ডিম ফোটে বেরিয়েছে ব্লু। সে একাই। তার কোনো ভাই-বোন নেই। বাবা-মায়ের ভালোবাসা তাই সবটুকুই পাচ্ছে সে। তার গায়ের রং সবুজ ; কিন্তু তবুও তার নাম ব্লু রেখেছে বাবা-মা। তার জন্মের পর কলোনির অনেক পাখিই তাকে দেখতে এসেছিল। টিয়া পাখির বাচ্চা সে, সবাই একটু বেশিই স্নেহের চোখে দেখছে ওকে।

উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে ছোটো নদী। নদীর দুই পাশে পাহাড়। পাহাড়ি ঢালে গড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো গাছ। লম্বা একটা গাছের কোটরে ওদের বাসা। আম্মুর কাছে গল্প শুনেছে ব্লু, তার বাবার বন্ধু কাঠঠোকরা তাদের এ বাসা তৈরি করে দিয়েছিল। ব্লু এখনো উড়া শেখেনি। ওদের বাসার নিচে লম্বা একটা গাছের ডাল। ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে ব্লু। কলোনির বকগুলো ওর সাথে প্রায়ই দেখা করতে আসে। ওকে গল্প শোনায়। আর কলোনির কাক কাকুর কাছে সব খবরাখবর পাওয়া যায়। সে নানা দেশে ঘুরে, লোকালয়ে যায়, নানা দেশের নানারকম খবর সে জোগাড় করে আনে। ব্লু দাড়িয়ে আছে বাহিরে। ওর আব্বু-আম্মু এখনো ফিরে আসেনি।

এখন বিকেল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে হেলে আলো ছড়াচ্ছে। ব্লুদের বাসার এখান থেকে পাহাড় নদীসহ সবকিছু দেখা যায়। পাহাড় পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নদী বয়ে চলেছে। ব্লু ভাবে, সে উড়া শিখলে সব এলাকা উড়ে বেড়াবে। কা-কা করতে করতে কাক কাকু উড়ে যাচ্ছিল। ওকে দেখে এগিয়ে এল কাক কাকু। গাছের লম্বা ডালটায় বসে ব্লু কে বলল, 'কি ব্যাপার বৎস, একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছ?'

'কিছু না, বাহিরের প্রকৃতি কত্ত সুন্দর। তুমি তো অনেক দেশে ঘুরে বেড়াও ; বলো তো, ঐ যে নদী বয়ে চলেছে, এই নদীর শেষ কোথায়?'

'দক্ষিণে সাগর। নদীটা সাগরে পড়েছে। আর উত্তরে অন্য নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এদিক দিয়ে গেলে মানুষের বসতি পাওয়া যাবে।' একটু থামল কাক, তারপর আবার বলল, 'তা বৎস, তোমার উড়ার কী খবর?'

'ডানায় এখনো পালক উঠেনি ভালোভাবে। এখনো দেরি হবে উড়তে।'

'উড়া শিখলে তবেই স্বস্তি, জানো লোকালয় থেকে দুষ্টু লোকেরা আসে। তারা বাচ্চা পাখিদের ধরে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেয়। এখন সাবধানে থাকবে কেমন?' বলেই কা কা কা কা করতে করতে চলে গেল কাক কাকু। কাক কাকুর কথা শুনে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল ব্লু। মনে মনে রাগও হলো কাকের উপর। দুঃসংবাদ দেয়া ছাড়া কি তার কোনো কাজ নেই? কাকের কথা ভালো না লাগলেও পরদিন সকালে এর সত্যতা দেখতে পেল ব্লু। সে তখনও বাসায় ঘুমিয়ে ছিল, ওর আব্বু-আম্মু বাহিরে খাবারের খোঁজে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ বাহিরে পাখিদের চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল ব্লু'র। সেই সাথে ওরা যেই গাছে থাকে সেটা নড়ে উঠল। কি হয়েছে তা দেখতে বাহিরে যেতেই আঁতকে উঠল সে। একটা লোক গাছ বেয়ে ওদের বাসার দিকে উঠে আসছে। কাক কাকু এমন মানুষের কথাই তো বলেছিল। ভয় পেয়ে গেল ব্লু, দৌড়ে বাসার মধ্যে চলে গেল সে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। তাকে ধরে একটা খাঁচায় ভরা হলো। ঠিক সেই সময় কোথা থেকে যেন ওর আব্বু উড়ে এল, দুষ্টু লোকটার মাথায় ঠোকর দিতে তেড়ে এলেন তিনি। তবুও লোকটা ব্লু-কে ছাড়ল না। ব্লু-কে নিয়ে অনেক দূর চলে এল লোকটা, দূর থেকে দেখল ব্লু, ওর আম্মু মুখে খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে, সেটা আর খাওয়াতে পারল না ব্লু-কে। মুখ থেকে খসে পড়ল খাবারটি। এক সময় তাদের কলোনি ছেড়ে অনেক দূর চলে

এল লোকটা। বক ও কাক কাকুর ডাকটাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ব্লু'র সাথে সেদিন আরো অনেক পাখি ধরা পড়েছিল। সবগুলোই ছিল উড়তে না পারা বাচ্চা পাখি। সেদিন বিকেলে বাজারে তোলা হলো ওদের। ব্লুকে একটা লোক কিনে নিলো। একটা খাঁচায় ভরে তাকে বাড়ির বেলকনিতে রাখা হলো। তারপর থেকেই বাড়ির পিচ্চি একটা ছেলে সবমসময় ওর খাঁচার কাছে ঘুর ঘুর করে। নানা কথা শোনায় ওকে, যেগুলো একদম ভালো লাগে না ব্লু'র। এখানে আসার পর মজাদার সব খাবার দেয়া হচ্ছে ওকে। বাবা-মা ছেড়ে বন্দি জীবনে থেকে ভালো খাবার কারো ভালো লাগে? ব্লু'র খুব কষ্ট হয় ওর আব্বু-আম্মুর জন্য। ওকে ধরে আনার দিন আব্বু-আম্মুর চোখে পানি দেখেছিল সে। বেলকনির এই পরিবেশটাও অসহ্যকর। কলোনিতে সে কত সুন্দর জায়গায় ছিল! এখন ওগুলো মনে হলে দম বন্ধ হয়ে আসে ব্লুর। এভাবেই কেটে গেল কয়েক মাস। একা একা ভালো লাগে না ব্লু'র। অনেকদিন সে কোনো পাখি বন্ধুকে দেখেনি। হঠাৎ একদিন ভাগ্যক্রমে তার কলোনির কাক কাকুর সাথে দেখা হয়ে গেল। নানা দেশে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে এদিক দিয়েই কোথাও যাচ্ছিল সে। ব্লু-কে দেখে চিনতে ভুল হয়নি তার। যদিও এত দিনে ব্লু বেশ বড়ো হয়ে গেছে। ডানাগুলোতেও পালক উঠেছে। কাক কাকুকে দেখে খুব ভালো লাগল ব্লু'র। অনেকদিন পর পরিচিত কাউকে দেখে মনটা ভালো হয়ে উঠল ওর। প্রথমেই ব্লু প্রশ্ন করল, 'আব্ব-আম্মু কেমন আছে? তারা আমাকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

'তোমার আব্বু-আম্মু ভালো আছে, কিন্তু সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে ওরা। তোমাকে অনেক খুঁজেছে, কোথাও পায়নি। আমি আজ তোমাকে পেলাম। মন খারাপ করো না, আমি তোমার আব্বু-আম্মুকে নিয়ে আসবো এখানে।'

'সত্যি বলছ?' খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল ব্লু। কিন্তু পরক্ষণে বলল, 'তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নাও না কাকু, আমি তোমার সাথে চলে যাই।'

'সে ক্ষমতা আমার থাকলে এতক্ষণে তাই করতাম বৎস। তুমি মন খারাপ করো না। আমরা চেষ্টা করবো তোমাকে ছাড়ানোর। আজ আসি, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

পরদিন কাক কাকু তার আব্বু-আম্মুকে নিয়ে এসেছিল। ব্লু আব্বু-আম্মুকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আব্বু-আম্মু ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। এরপর থেকে প্রতিদিন কাক কাকু বা আব্বু-আম্মু ওর সাথে দেখা করতে আসতো। তারা ওকে উড়া শেখার কৌশল শিখিয়ে দিত। ব্লু ওদের কথা মতো খাঁচাতেই উড়ার প্র্যাকটিস করত। আগের চাইতে সময়গুলো ভালো যাচ্ছে ব্লু'র। প্রতিদিন আব্বু-আম্মুর সাথে দেখা হচ্ছে। এখন আর একা একা মনে হয় না নিজেকে। বাড়ির শাওন নামের পিচ্চি ছেলেটার সাথেও বেশ খাতির জমে উঠেছে। পিচ্চি ছেলেটা ওকে মানুষের ভাষা শিখিয়েছে। ব্লু এখন মানুষের ভাষায় অনেক কথাই বলতে পারে। পিচ্চি ছেলেটা ওর খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে উঠেই সে ব্লু'র কাছে ছুটে আসে। ব্লুকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে বলে মাঝে মাঝে ওর আম্মুর কাছে বকাও খায়। আজ সকালে উঠে পিচ্চি ছেলেটাকে দেখেনি ব্লু। ছেলেটার মা আজ ব্লুকে খাবার দিয়ে গেছে। অনেক পরে ছেলেটা বেলকনিতে এল। পিচ্চিটাকে দেখে আজ অবাক হলো ব্লু। ওর মাথায় একটা কাপড় বাঁধা। সবুজ রঙের মাঝখানে লাল রঙের বৃত্ত। পিচ্চিটার আব্বু বলল, 'বিজয় দিবস কেমন উদযাপন করলে তোমরা?'

'খুব ভালো আব্বু। প্রথমে কোরান তিলাওয়াত তারপর জাতীয় সংগীত গেয়েছি আমরা।

শহিদদের জন্য দোয়া করার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে।'

'বেশ ভালো।'

'আচ্ছা আব্বু, স্যাররা বলল আজকে নাকি আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'পাকিস্তানিরা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল, তাই না আব্বু?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন তো আমরা স্বাধীন।'

'আমরা কেন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম আব্বু?'

'কারণ স্বাধীনতা সকল প্রাণের অধিকার। পরাধীন ভাবে বেঁচে থেকে কোনো গৌরব নেই, নেই কোনো স্বার্থকতা।'

'পাকিস্তানিরা খুব অন্যায় করেছিল তাই না আব্বু? তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, এগুলো তো জানা কথা।' ওর খাঁচার কাছেই কথা বলছে শাওন ও তার আব্বু, তাই একান্ত বাধ্য হয়েই ওদের কথা শুনছে ব্লু। বিরক্ত লাগছে ওদের কথায়। কিন্তু শাওনের পরবর্তী কথায় আগ্রহী হয়ে উঠল ব্লু।

শাওন বলল, 'তাহলে আব্বু, আমরাও তো অন্যায় করছি।'

'কি অন্যায়?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল শাওনের আব্বু।

'ঐ যে, টিয়া পাখিটাকে খাঁচায় আটকে রেখেছি। তার বাবা-মা'র থেকে দূরে সরিয়ে তার স্বাধীনতাকে আমরা কেড়ে নেইনি?'

'তাই তো, ওভাবে ভাবলে এটা অন্যায়ই হয়।'

'আব্বু আমি ওকে ছেড়ে দিতে চাই, বেচারা কেমন মনমরা হয়ে থাকে খাঁচায়।'

'ওকে ছেড়ে দিলে কার সাথে খেলবি?'

'আমার খেলার অনেক বন্ধু আছে, তাই ওকে বন্দি করে কষ্ট দিতে চাই না। তারও তো আমাদের মতো স্বাধীনভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে।' কথাগুলো বলে চোখ মুছল শাওন।

শাওনের আব্বু শাওনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'খুব সুন্দর উপলব্ধি, আমি খুব খুশি হলাম তোর কথা শুনে। সবারই স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে, ওকে মুক্ত করে দে। তোকে অন্য খেলনা কিনে এনে দিব।' শাওন আর দেরি করল না, এগিয়ে গেল খাঁচার দিকে। ব্লু এ দিকেই তাকিয়ে ছিল, এবার সে কথা বলে উঠল, 'আমার মতো আরো অনেক পাখি এই শহরে খাঁচায় বন্দি। তাদের কী হবে?'

'তুমি চিন্তা করো না, আমি স্কুলে আমার বন্ধুদের নিয়ে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করব।'

খুশিতে দুই পাখা উঁচিয়ে ব্লু বলে উঠল, 'শাওন.... ই... জ দ্যা গ্রেট।' ব্লু'র ভাঙা ভাঙা কথায় হা হা করে হেসে দিল শাওন ও ওর আব্বু। খাঁচা থেকে ওকে বের করে আনল শাওন। শেষবারের মতো হাত বুলিয়ে দিল ওর পালকে। ব্লু ওর পালক দিয়ে শাওনের গালটা ঘষে দিল। শাওন মুক্ত করে দিল ব্লু-কে। ব্লু গোটা ঘরে উড়ে এক বার চক্কর দিল, তার পর বেলকনির বাহিরের পেয়ারা গাছে গিয়ে বসল, ব্লুর আব্বু-আম্মু আগেই এসে সবকিছু দেখছিল। ব্লু আর একবার তাকাল শাওনের দিকে। মলিন একটা হাসি ফুটে উঠেছে তখন ওর মুখে। ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে ব্লুর। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। পাখা নেড়ে ওকে বিদায় জানাল ব্লু। এবার আব্বু-আম্মুর সাথে উড়াল দিল কলোনির পথে। পেছনে ফিরে আর তাকাল না ব্লু। আজকে সে মুক্ত ডানা পেয়েছে। ■

সুলতান মাস্টার

মাহমুদুল হাসান খোকন

দোকানদাররা ঈদের সময় যতটা কাপড় চোপড় বিক্রি করে বছরের বাকি সময়গুলো তার ১০% বিক্রি করে না বোধ হয়। ঈদের বিক্রি দিয়ে পুরো বছর চলে। এতে আয়ও যথেষ্ট হয়। এত মানুষের ভিড়! দোকানে না গেলে বিশ্বাস করা যায় না। আর দামও বেশ চড়া। তবু মানুষ কাপড় কিনে। একজন আরেকজনেরটা দেখে কাপড় কিনে। সবাই কিনেছে তাই আমাকেও কিনতে হবে। এভাবে একেকজন অনেকগুলো করে কাপড় কিনে।

আসলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় কেনা উচিত নয়। এটা অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে। পুরান কাপড়ের ব্যবহার অনেক কমে যায়। আয় রোজগার করতে অনেক কষ্ট করতে হয় আবার অনেক সময়ও লাগে। আর ব্যয় বা খরচ করতে সময় লাগে মাত্র কয়েক মিনিট। বাড়ির কর্তা সবাইকে নিয়ে নতুন কাপড় কিনতে যায়। সবাইকে ঈদের নতুন পোশাক দিতে হয়।

এমনই একজন দায়িত্ববান বাড়ির কর্তা হলো সুলতান মাস্টার। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত। বেতনের অল্প কিছু বোনাস পায়। তা দিয়ে ঈদ চলে যায়। দুই মেয়ের বাবা সুলতান মাস্টার। ছেলে নেই। মেয়ে দুইটি বিবাহিত। দুই মেয়েরই ছেলে সন্তান আছে একজন করে। বড়ো জামাই সাইফুর একজন মালামাল ব্যবসায়ী, অন্যজন ছোটো মেয়ে রাবেয়ার স্বামী রফিকুল একজন ফল ব্যবসায়ী। তুলনামূলক জামাইরা বেশ ভালো। ছোটো মেয়েটি বাবার কাছ থেকে কিছু নিতে চায় না বরং বলে আমাদের জন্য কোনো কাপড় কেনার দরকার নেই। এই টাকা দিয়ে বাবা তোমার ও মায়ের জন্য ভালো দেখে কাপড় কিনো। তোমার জামাইও তাই বলে। আমাদের জন্য যেন কিছু না কিনে।

সুলতান মাস্টার বড়ো মেয়েকে ঈদের সপ্তাহখানেক আগে ফোন করল, রোকেয়া! মা আমার, কেমন আছ?

-হ্যাঁ বাবা ভালো। তোমরা কেমন আছ? জানতে চাইলো বড়ো মেয়ে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

-হ্যাঁ মা, আমরা ভালো আছি। আমার নানাভাই কেমন আছে?

-হ্যাঁ বাবা, ভালো আছে। আবারো সুলতান মাস্টার জানতে চাইলো জামাই কেমন আছে?

-হ্যাঁ বাবা ভালো আছে।

বিয়াই বিয়ান ভালো আছে তো?

-হ্যাঁ বাবা সবাই ভালো আছে।

তো বাবা কী খবর বলো?

মা, ঈদ তো প্রায় এসে গেল। কাপড় কবে নিবে? কবে আসবে?

হুমম। ঠিক আছে বাবা কালই যাব। কেননা তোমার জামাইয়ের ব্যবসা প্রায়ই বন্ধ থাকে। কখনও একবেলা মানে বিকেল করে দোকান খুলে। আর শোনো বাবা এবারও কিন্তু সবার জন্য কাপড় আমি পছন্দ করে কিনব।

আমি জানি মা। এসো তোমরা।

কথামতো পরদিন সকাল সকাল বড়ো মেয়ে রোকেয়া স্বামী সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে হাজির। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সন্তানকে ঘুমে রেখে বাজারে রওয়ানা হলো। বেশ কয়েকটি দোকান ঘুরে ঘুরে নিজের পছন্দমতো মেয়ের, জামাইয়ের ও বিয়াই-বিয়ানের জন্যও কাপড় কিনে দিলো। নতুন কাপড় কিনে সবাই আনন্দ নিয়ে পর দিন মেয়ে জামাই চলে যাবে। যাওয়ার সময় বাসায় ফিরল বাবা। সুলতান মাস্টার বলল, মা ঈদের আগে এসো কিন্তু সবাই।

যথারীতি ঈদ এসে গেল। দুই মেয়েই স্বামী সন্তান নিয়ে ঈদের আগেরদিন এসে হাজির। বড়ো বোন ছোটো বোনকে তাদের নতুন কাপড় দেখাচ্ছে আর বলছে দেখো তো কেমন কাপড়গুলো? ছোটো বোন সব কাপড় দেখে বলল, হুমম। খুব ভালো। নিশ্চয় বাবা কিনে দিয়েছে?

হ্যাঁ বলে উত্তর দিল বড়ো বোন রোকেয়া। তোদেরকে দেয়নি বাবা? দিতে চেয়েছিল আমরাই নেইনি। বাবার কাছ থেকে নেওয়ার দরকার কী। এখন বাবা-মার জন্য আমাদের অনেক কিছু করার আছে। আমাদের বিয়ের পর বাবাকে আমরা তেমন কিছুই দেইনি। সেটা আমাদের মাথায়ই আসেনি। সেটা কখনো লক্ষ করেছিস? আর বাবাও নিজের কষ্ট চেপে রেখে মুখে হাসেন। এরই মধ্যে সুলতান মাস্টার বাইরে থেকে বাড়ি আসলেন। তাদের দুই বোনের কথা বলা বন্ধ হলো। যে যার যার মতো কাজে গেল।

রাতে ছোটো মেয়ে রাবেয়া তার বাবার রুমে নানা বিষয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে বড়ো বোনের প্রসঙ্গ আনলেন। রাবেয়া বলল, প্রতি বছর আপুর জামা কাপড় কেনার বিষয়টা আমার ভালো লাগে না। বাবা বললেন, আমি সাধারণ শিক্ষক, বোনাসও তেমন পাই না। তার ওপর তোমার বোনের আবদার আমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো ঋণও করতে হয়। তবু সন্তান ভালো থাক সব বাবা-মা ই চায়। তোমরা ভালো থাকো সবসময় এ দোয়াই করি। স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে সংসার কর। সদা এই কামনা করি।

বাইরে থেকে বাবার সব কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না রোকেয়া। কান্না বিজড়িত হয়ে হুড়মুড় করে ঘড়ে ঢুকে বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কখনোই এ কাজ করবো না। ছোটো বোন, সুলতান মাস্টার ও তাদের মা মরিয়ম বেগম স্তব্ধ তাকিয়ে রইল রোকেয়ার দিকে। ■

মো. আবদুল্লাহ, শ্রেণি নার্সারি, আল কারীম স্কুল, আশুলিয়া, সাভার।

মা তোমার

সায়মা আনজুম

মায়ের হাতে মাংশ-পোলাও রান্না
মধুর চেয়ে সুস্বাদু নেই যার তুলনা
এছাড়া শুটকি, চাটনি সরিষা দিয়ে ইলিশের ভাপা
মা তুমি কিনে দাও
নতুন নতুন জামা-কাপড়
যা থাকে বায়না,
তোমার সাথে নেই কারো তুলনা।
মা তুমি সেবা-যত্নে খুশিতে ভরে দাও মন
তা নিয়েই বড়ো হই।
সবই তোমার অবদান, প্রেরণা।
মা তোমার নেই কোনো তুলনা।

সালাম জানাই তাঁকে

সাঈদ তপু

মা যে আমার হারিয়ে গেল
পাই না খুঁজে আর
নেই কোথাও কোনোই আলো
ধু-ধু অন্ধকার
একে শুধাই ওকে শুধাই
পাই না তেমন সাড়া
আর কতকাল থাকব আমি
কোলটি মায়ের ছাড়া
এমন সময় হঠাৎই এক
বজ্রবাণী শুনি
সেদিন থেকে নতুন আশার
স্বপ্ন বুকে বুনি
আঁধার কাঁপা স্বরের ধ্বনি
প্রতিধ্বনি হয়ে
ভাঙল সকল বাধার পাঁচিল
আনলো সকাল বয়ে
সেই সকালের স্নিগ্ধ আলোয়
পেলাম ফিরে মাকে
এমন যিনি সকাল দিলেন
সালাম জানাই তাঁকে।

মা

ওয়াসিফা ইবনাত

মা তুমি আজ অনেক দূরে
না ফেরার ঐ দেশে
তোমার কথা মনে পড়ে
পাব তোমায় কিসে।

কোথায় আছ কেমন আছ
জানতে ইচ্ছে করে
সবাই নিলো মুখ ফিরিয়ে
ফিরে এলাম ঘরে।
তুমি ছাড়া এই দুনিয়ায়
নেইকো কোনো সুখ
তোমার ঘরে গেলে আমার
হু হু করে বুক।

একাদশ শ্রেণি, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা।

ফল খাবো বারো মাস

মো. রুস্তম আলী

বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠে আম পাকে
আরো পাকে কাঁঠাল।
আষাঢ়-শ্রাবণে আতা আর পেয়ারা পাকে
আর পাকে তাল।

ভাদ্র-আশ্বিনে আমড়া পাকে
পাকে আনারস।
আরো অনেক ফল পাকে
রসে করে টস্ টস্।

কার্তিক-অগ্রহায়ণে জাম্বুরা, জলপাই
আরো পাকে আমলকি।
আছে তাতে প্রচুর ভিটামিন-সি।

পৌষ-মাঘে খেজুরের রস
কলা, লেবু, ডাব আর পেঁপে
খাবো বারো মাস।

ফাল্গুন, চৈত্রে- ডালিম পাকে
ডালিমের গুণের নাই শেষ।
ফল খাব করে আয়েশ
সুস্থ থাকব বারো মাস।

গল্প

লড়াই

ফজলে রাব্বী দ্বীন

খেলার মাঠের এক পাশে দাড়িয়ে আছে অয়ন। আজ তার মন খুব খারাপ। স্কুল ছুটির পর এখনো সে বাড়ি যায়নি। ম্যাথ ক্লাস টেস্টে সবাই যেখানে কুড়ি তে কুড়ি পেয়েছে সেখানে ও পেয়েছে মাত্র দুই। শিপন স্যারের একটা বকাও মাটিতে পরেনি। এ নিয়ে দশের ঘর ছাড়ালো। ম্যাথ না মিলাতে পেরে আরো যে কত দিন ঝারি খেতে হবে কে জানে! এখন বাড়িতে যেতেও ভয় লাগছে। এদিকে রতনের সাথেও তার হয়েছে তুমুল ঝগড়া। গত ক্লাসে রতন ঠাট্টা করে হেসে ছিল বলে অয়ন তার খাতার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিল। আর তাতে রতন আরো ক্ষেপে যায়। দু'জন দু'জনার শার্ট ছিঁড়ে ফেলে। শেষমেষ রফিক স্যার এসে এই দুইজনকে সবার সামনে কান ধরিয়ে পঞ্চাশবার উঠ বস্ করিয়ে তবেই মুক্তি দিয়েছিল। স্যার না থাকলে সেদিন হয়ত দু'জনের স্কুল ব্যাগ দুটোর অস্তিত্বই থাকত না। মা অবশ্য সেই ব্যাপারে জেনেছিল। কানে হাত গেলেই এখনও ব্যাথাটা অনুভব হয়। বাবা জানলে হয়ত স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিত আর বলত, 'অনেক কিছু করেছ বাবা, আর স্কুলে গিয়ে কাম নাই। এই যে কাঁচি নাও আর মাঠে গিয়ে বলদের জন্য এক বস্তা ঘাস কেটে নিয়ে আস।' অথবা এত কিছু না বলে সরাসরি মুখ ফসকে বলে দিতে পারে, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই।'

বিকেলের পাখিরা তখনও ঘরে ফেরেনি। পাখিরাও কোলাহল করে বাঁশ ঝাড়ে বসে চিৎকার চেঁচামেচি করে! অয়নের ভাবনার মাঝে কে যেন তার মাথায় নিঃশব্দে একটা টোকা দিল। অয়ন চমকে উঠে পেছনে তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। অথচ অয়নের ভুল হবার কথা নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটা টোকা। এবার অয়ন থামল না। আশপাশে খুঁজে হঠাৎ আম গাছের উপরে চোখ গেল। একি! কচি বয়সের দুরন্ত একটা ছেলে আম গাছের ডালে উপুড় হয়ে ঝুলে আছে। অয়ন ভয় পেয়ে গেল।

'এই তুমি ওখানে কি করছ? পড়ে যাবে তো। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসো।' অয়ন কথাটা বলতে না বলতেই ছেলেটা গাছের ডাল থেকে হাত ছেড়ে দিল। আর অমনি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে দাঁড়িয়ে অয়নের সামনে এসে বলল, আমি যখন তোমার মাথায় টোকা দিয়েছিলাম, তখন তুমি ভয় পেয়েছিলে, তাই না?'

অয়ন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, পাইনি।'

'কেন পাওনি?'

'জানি না, তার আগে বলো তুমি গাছ থেকে ওই ভাবে হাত ছেড়ে দিলে কেন? যদি ব্যথা পেতে? পা দুটি যদি ভেঙে যেত তখন কী করতে?'

'ও, তার মানে তুমি আমার পা ভাঙা নিয়ে চিন্তিত ছিলে, এক কথায় অয়ন ভয় পেয়েছিল।'

অয়ন চমকে উঠে বলল, 'তুমি আমার নাম জানলে কী করে?'

'আমি শুধু নাম না, তোমার সবকিছুই জানি। তুমি আজ ক্লাসে তোমার নিজের নাম লিখতে ভুল করেছিলে। 'অয়ন' না লিখে লিখেছিলে 'অযন'। স্যার যখন তোমায় বকা দিচ্ছিল তখন আমি বাইরে ডাব গাছের মাথায় বসে পানি খাচ্ছিলাম আর হাসতে হাসতে গাছ থেকে পড়েও গিয়েছিলাম। এই যে দেখো আমার পা-টা ভাঙা।' এই বলে ছেলেটা নিচু হয়ে তার পা-টাকে টান দিয়ে খুলে অয়নের সামনে মেলে ধরল। আকাশে যেন অমনি বিজলি চমকে উঠল। অয়ন আর ঠিক থাকতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অয়নের যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে নিজেকে নদীর ঠিক মাঝখানে নৌকার মাঝে পড়ে থাকতে দেখল। তখন চারদিকে বাতাস হু হু করে বইছে। নদীতে ঢেউ ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর সেই ঢেউয়ে নৌকা দুলছে আপন মনে। তার মাথার কাছেই বৈঠা হাতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত ছেলেটা। অয়ন কাঁচুমাচু করে বলল, 'তুমি কে?'

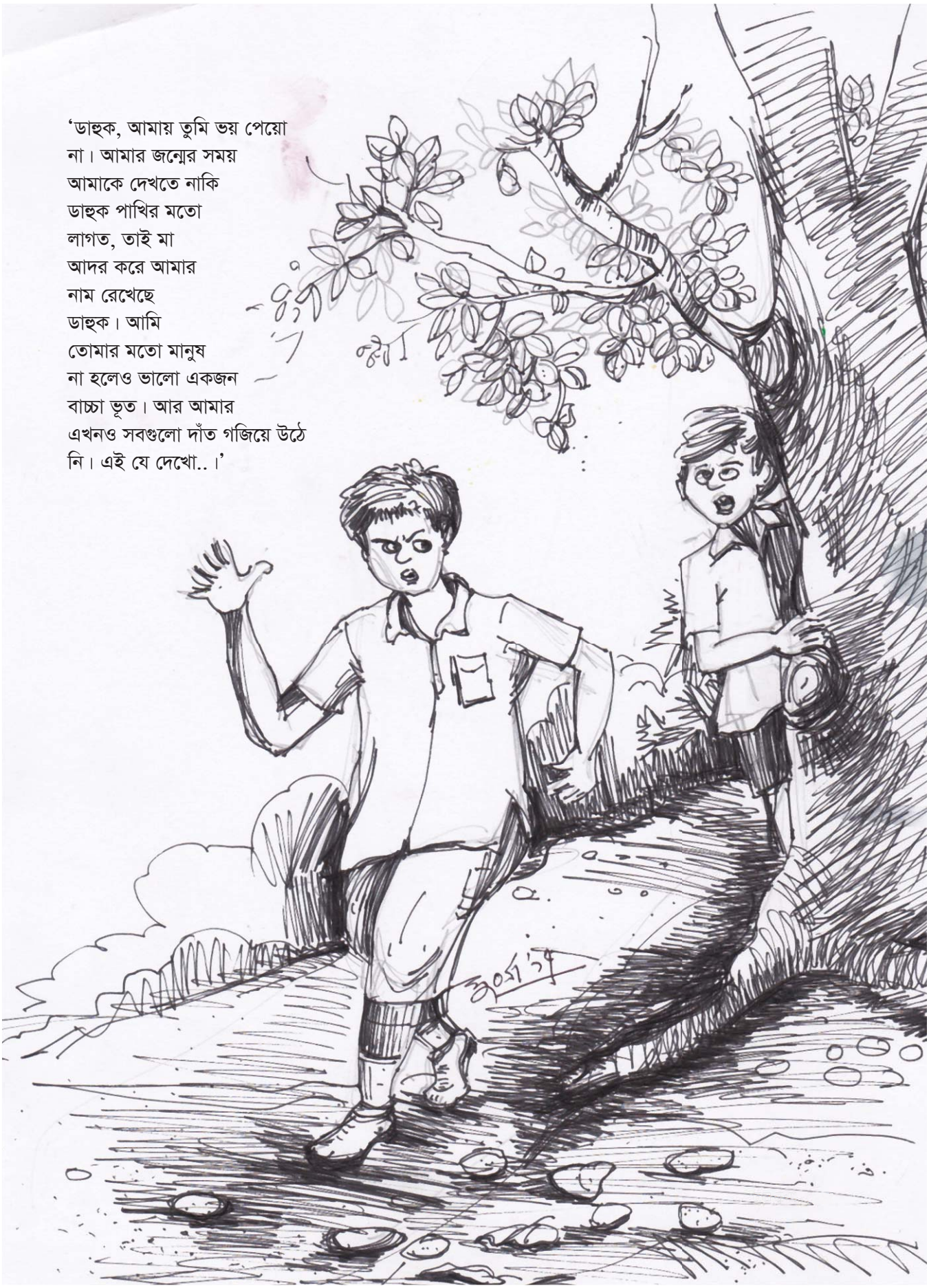
‘ডাহুক, আমায় তুমি ভয় পেয়ো
না। আমার জন্মের সময়
আমাকে দেখতে নাকি
ডাহুক পাখির মতো
লাগত, তাই মা
আদর করে আমার
নাম রেখেছে
ডাহুক। আমি
তোমার মতো মানুষ
না হলেও ভালো একজন
বাচ্চা ভূত। আর আমার
এখনও সবগুলো দাঁত গজিয়ে উঠে
নি। এই যে দেখো..।’

ডাহুক তার পঁয়তাল্লিশটা দাঁত অয়নকে দেখিয়ে আবার বলল, 'বয়সটা যদিও বিশের এর ঘর ছাড়ায়নি তবুও মা বলেছে আমি নাকি পেকে গেছি। তাই আমার ফিডার খাওয়া বারণ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু তুমি কোথায় থাকো? আর এখানে কেন? আমার সাথে তোমার কী কাজ?'- বলল অয়ন।

'আমরা তোমাদের এই গ্রামেই থাকতাম। ঐ যে ছোটো দিঘিটা দেখতে পাচ্ছ তার ঠিক পাশেই আম গাছটার মাথায়। তোমাদের এই মাঠেই আমরা খেলতাম। কিন্তু তোমার বাবা ও কাকু একদিন...'- বলতে বলতেই থেমে গেল ডাহুক।

'আমার বাবা ও কাকু তোমাদের কী করেছে?'

'আমাদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'কী বলছ তুমি? এটা কীভাবে সম্ভব? আর তারা এ কাজ কেন-ই বা করতে যাবেন?'

'জিদ। সবকিছু জিদের কারণে করেছে। পৌষ মাসের শেষটায় তোমার বাবা একদিন পালং তৈরির জন্য আম গাছটার পাশে জাম গাছটা কেটে ফেলে। আর তাই দেখে তোমার কাকু পরদিন আমাদের থাকার প্রিয় আম গাছটাকেই টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।'

'হুম। আমি এটা জানি। এ নিয়ে উনাদের মাঝে অনেক রাগারাগি দেখেছি।' -দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল অয়ন।

'শুধু এই টুকুতে থেমে থাকলে হয়ত বা এতটা কষ্ট পেতাম না। আমরা আমাদের ঘর হারানোর পর দিঘির পূর্ব পাশটায় চলে যাই। ভিটে মাটি হারিয়ে লতা-পাতা খেয়ে বাঁচতে শুরু করি। ওখানে ছোটো জাম্বুরা গাছের মাথায় নানুদের সাথে ঘর বাঁধি। কিন্তু ভূতের ভিড়ে গাছটা এতটাই হেলে পড়েছিল যে কখন যেন ভেঙে মাটিতে পড়ি আর কোমড় ভাঙি তাই নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। চিন্তাটা অবশ্য ভুল ছিল না। একদিন পরেই তা বুঝতে পারি। রাত পোহাবার আগেই দেখি গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছি। নানুর পা দু'টো খোলা আসমানে আর মাথাটা কিঞ্চিৎ মাটির উপর। সবার চেঁচামেচি ও কান্নার রোল শুনে বুঝতে পারি নানু আর পৃথিবীতে নেই। মনের দুঃখে বাবা-মাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ির পাশেই গম-ক্ষেতের ঝোপে ইঁদুরের মতো বাঁচতে শুরু করি। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! চৈত্রের শেষ প্রহরে ঝোপের মধ্যে কোথা থেকে যেন উড়ে এসে লাগল আগুন। তাতে গমক্ষেত তো পুড়ল পুড়লই, আমার বাবাও পুড়ে মারা গেল। অবশ্য খানিক পরেই বুঝতে পারি এই কাজটা কে করেছে!'

'কে করেছিল?'- রাগি স্বরে বলল অয়ন।

'তোমার কাকু। তোমার কাকুর আম গাছটা কেটে ফেলার পর থেকেই এই সব কাণ্ড-লীলা আরো দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। তোমার বাবা কোনো কথা না বলে বাগান থেকে মিষ্টি বরই গাছটা রাতের অন্ধকারে কেটে দিঘির জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এতে তোমার কাকু রেগে মেগেএমন কাজ করায় আমার খুব ক্ষতি হলো।'- ডাহুক কথাগুলো বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে উঠল।

'তোমার কি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করেনি?' অয়ন বলল।

'ইচ্ছে করেছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই মুহূর্তেই তোমার বাবা ও তোমার কাকুর ঘাড় মটকে দিয়ে আসি। কিন্তু পারিনি।'

'কেন?'

'তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তোমরা ভাই-বোনেরা আমার মতো বাবা হারা হয়ে যাবে, এই ভেবে।

অয়ন ড্যাব ড্যাব করে কেবল তাকিয়ে আছে ডাহুকের দিকে। শরীরে তার হালকা কাঁপুনি। মনে হচ্ছে নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে পানিতে।

'এখন তুমি কী করবে?' -নিচু স্বরে কথাটা বলে ফেলল অয়ন।

'চলে যাব। অনেক দূরে চলে যাব। যেখানে কোনো মানুষ বাস করে না সেখানে।' ■

অসময়ের উপলব্ধি

কবির কাঞ্চন

তিথি ও বিথি দুজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তারা একই ক্লাসে পড়ে। বিথির বাবার একটি ফার্মেসি আছে। আর তিথির বাবার স্কুলের সম্মুখে একটি ছোট্ট টং দোকান। স্কুলের বিরতির সময় তারা দুজনেই তিথির বাবার দোকানে আসে। টিফিন খায়।

টং দোকান হলেও তিথির বাবা সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। নিজে তেমন পড়াশুনা করতে না পারলেও পড়াশুনার প্রতি তার সম্মানের কোনো কমতি নেই। এই টং দোকানে বসে তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন তার একমাত্র সন্তান পড়াশুনা শেষ করে একজন আদর্শ মানুষ হবে। সুশিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

বাবার মনের লালিত স্বপ্নের কথা তিথিও জানে। তাই সে ছোটোবেলা থেকে পড়াশুনাকে হৃদয়ে আঁকড়ে ধরে বড়ো হচ্ছে। তিথির আরেকটি গুণ তার বাবাকে মুগ্ধ করে। সেটি হলো তিথির উদারতা। এ বয়সে সে অন্যের কষ্ট বোঝে। কাউকে কষ্টে দেখলে সাধ্যমতো সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়। সে জানে তার বাবার তেমন সামর্থ্য নেই। তবুও স্কুলের টিফিনের সময় এক দুইজন সহপাঠীকে সাথে করে তার বাবার দোকানে নিয়ে আসে। এরপর বাবার দেওয়া টিফিন ওদেরকে নিয়ে ভাগাভাগি করে খায়। মেয়ের এমন কাণ্ডে তিথির

বাবাও বেশ খুশি হন। তিনি তিথির টিফিনের পরিমাণ আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেন।

আজ স্কুলের টিফিন টাইমে তিথিকে বিষণ্ন থাকতে দেখে তার বাবা মনে মনে বিড়বিড় করে বলেন, নিশ্চয় আজ কোনো কিছু হয়েছে। নইলে আমার তিথি মামণির তো এমন করে থাকবার কথা নয়।

এরইমধ্যে দোকানের সামনে কাস্টমারদের ভিড়। তিনি আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ব্যস্ততা কমে গেলে দোকান থেকে বের হয়ে এসে তিনি তিথির কাছে বসে জিজ্ঞেস করলেন,

- কী হয়েছে, মামণি? আজ তোমার সাথে বিথিকে দেখছি না যে?

- বাবা, একটু আগে ওর সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছে।

- কী নিয়ে?

- আগামীকাল থেকে আমাদের স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছে। ও বলেছে আগামীকালই ওরা নাকি গ্রামের বাড়ি চলে যাবে। স্কুল বন্ধের সময়টাতে সেখানে আনন্দ করবে।

আমি বললাম, দেশের এমন মহামারির সময়টা না গেলে ভালো হয়। জবাবে ও আমাকে বলল, তুই যেতে পারবি না বলে এমন কথা বলছিস।

এখন তুমিই বলো না বাবা, সারাবিশ্ব যখন এই মহামারি নিয়ে আতঙ্কে আছে তখন আমাদের কী আনন্দ করার সময়?

- ওহ্! এই কথা। তুমি ঠিকই বলেছ। ও ছোটো মানুষ। হয়ত ভালো করে বুঝেনি। এতে রাগ করার কী আছে?

- কেন বাবা, আমাদের স্কুল কি বাড়ি যাবার জন্য ছুটি দিয়েছে? স্যাররা স্পষ্ট করে বলেছেন, বন্ধের সময় কেউ যেন বাসা থেকে বের না হয়। সেখানে সবাই যদি বাড়ির দিকে ছুটে তাহলে তো গ্রামের লোকজনও অসুখে পড়ে যাবে? ওরাও তো নিরাপদ থাকবে না। তাছাড়া আমি বিথিকে খুব ভালোবাসি, বাবা। আমি চাই না অসাবধানতা বশত ওর কোনো ক্ষতি হোক।

এই কথা বলে তিথি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে বিথি তিথির সব কথা শুনেছে। আর একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে না থেকে সে তিথিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বলল,

- না, তিথি, আমি বাড়ি যাব না। আমি আসলে তোর মতো ভেবে দেখিনি। করোনার এই সময়ে আমাদের সবাইকে তোর মতো করে ভাবতে হবে। আমাদেরকে নিজ নিজ অবস্থানেই নিরাপদে থাকতে হবে। সবকিছু আবার আগের মতো হয়ে গেলে আমরা সবাই আবার এক সাথে স্কুলে যাব, খেলব। সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ঘরে বসেই। ■

থাকব সাবধানে

আলিফ হোসেন

করোনাকালীন সময়ে
থাকব সবাই বাসায়
করব না অযথা
বাইরে আসা-যাওয়া।
হাত ধোব বেশি করে
সাবান পানি দিয়ে
সাবধানে থাকব
ভাই-বোনদের নিয়ে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, রেডিও কলোনি মডেল স্কুল, সাভার।

দায়

শফিক শাহরিয়ার

চার মাথার মোড়ে গ্রামের নতুন একটি স্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। অভিভাবকগণ আগ্রহ নিয়েই সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। যদিও প্রতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অল্প। স্কুলে খুব ভালো পড়ানো হচ্ছে। স্যার-ম্যাডাম তাদের প্রতি খুব যত্নশীল। ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার সম্ভবনা নেই বললেই চলে। স্কুলে মাসিক অবিভাবক সমাবেশ হয়। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের সাফল্যের কথাও জানাচ্ছেন।

টিনের বেড়ার স্কুল। শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ। শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের চোখে চোখে রাখেন। যেন কারো হাত-পা টিনে লেগে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি ছাত্র দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র জামাল। সে খুব শান্ত। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কামাল। কিন্তু সে খুবই চঞ্চল। সেদিন টিফিনের সময় সবাই খেলছিল। খেলতে খেলতে কামাল হঠাৎ জামালকে জোরে ধাক্কা মারে। জামালের পা টিনের একধারে লাগল। পায়ে খুব চোট পেল। পুরো স্কুলে শোরগোল পড়ে গেল।

স্কুলের কাছেই গ্রাম্য ডাক্তারের চেম্বার। প্রধান শিক্ষক সেখানে নিয়ে গেলেন তাকে। এরপর জামালের বাবা খবর পেয়ে শিগগিরই ছুটে এলেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, আপনি কেন না জানিয়ে আমার বাচ্চাকে এখানে নিয়ে

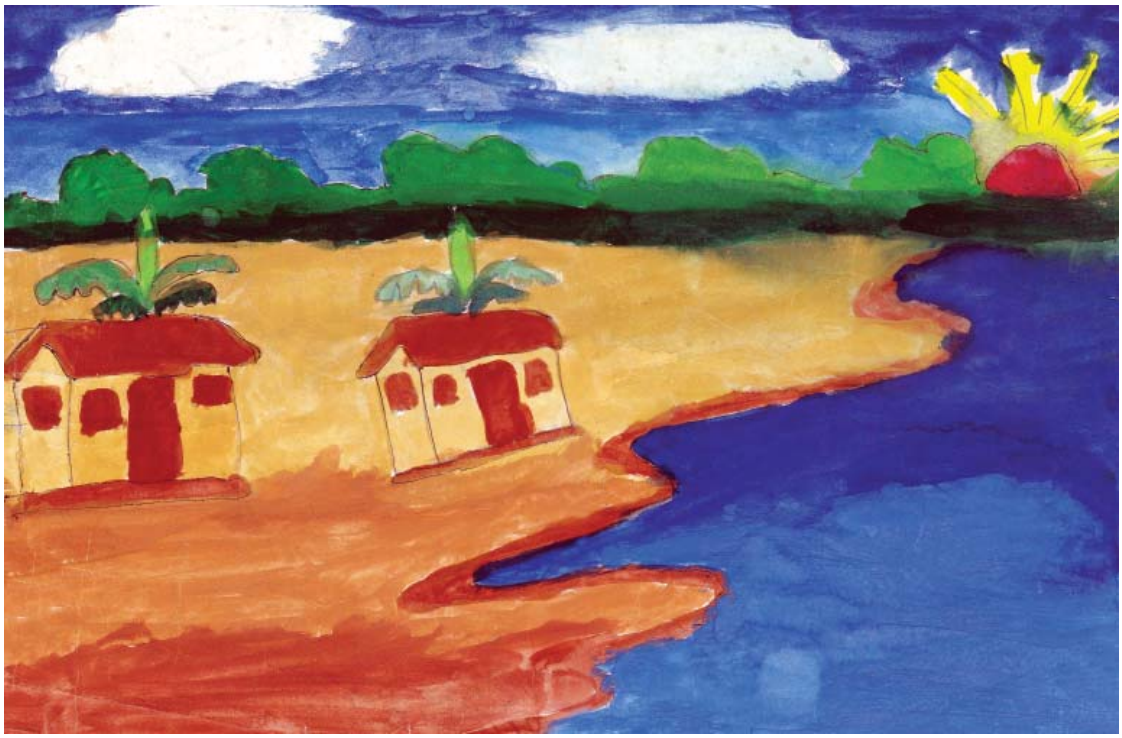

ইশরা হোসেন, ৮ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

এলেন? প্রধান শিক্ষক কথা না বাড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। ডাক্তার জামালের পা ব্যান্ডেজ করে বুঝিয়ে দিলেন ওষুধপত্র। প্রধান শিক্ষক ডাক্তারের বিল পরিশোধ করলেন। তারপর বাচ্চাকে স্কুলে আনা হলো। প্রধান শিক্ষক তার বাবাকে বললেন, বাচ্চা স্কুলে এলে কার দায়িত্ব? সে পুকুরে পড়ে গেলে অভিভাবক না আসা পর্যন্ত কি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে? আশা করি আপনি বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।

যাই হোক, স্কুলে শান্ত-চঞ্চল সব ছেলেমেয়েই থাকে। সবাই একই হয় না। সেটা সকলের বোঝা উচিৎ। বাচ্চা যে-কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবে। তাই বলে বাচ্চাদের সব আচরণের দায় স্কুলের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

জামাল কয়েকদিন স্কুলে আসতে পারেনি। তার মনটা ছটফট করছে। কিছুদিন পর সে সুস্থ হলো। সে আবার যথারীতি ক্লাস করছে। কামাল তার কাছে ক্ষমা চাইল।

স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন। শিক্ষার্থীদের সাফল্য তাদেরকেও আনন্দিত করে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতা তাদেরকেও কষ্ট দেয়। কিন্তু অনেক অভিভাবক আছেন যারা তাদের সন্তানদের ব্যর্থতার, দুরন্তপনার সব দায় স্কুলের উপর চাপিয়ে দেন। সব দায় নিয়েই শিক্ষকরা কাজ করে যান। পিছ পা হতে জানেন না। তাঁরা চান প্রতিটি শিক্ষার্থী মানুষ হোক। মানুষ হলেই শিক্ষকদের গর্ব, দেশের কল্যাণ। ■

শিশুদের লকডাউন পালন

সাবিনা ইয়াসমিন

ধন্যবাদ বাংলাদেশের শিশুদের। ধন্যবাদ এজন্য যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১৭ই মার্চ থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ২৬ শে মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এটা ছিল অঘোষিত লকডাউন। ৩০শে মে পর্যন্ত টানা ৬৬ দিন থাকে এ লকডাউন। এতে সব শ্রেণি পেশার জনগণকে ঘরের বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন অজুহাতে বড়োরা বাইরে বের হয়েছেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা, পুলিশি বাধা কিছুতেই তাদের পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে শিশুদের বাইরে বের হতে দেখা যায়নি একেবারেই।

বাবার পিছু পিছু, মায়ের হাত ধরে, বিকেলে খেলার ছলে–কোনো অবস্থাতেই তারা বাইরে বের হয়নি। সরকারের তথা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেছে, বড়োদের কথা মান্য করেছে। তারা ঘরেই থেকেছে। ঘরে থেকে লেখাপড়া করেছে, অনলাইনে ক্লাস করেছে। ঘরেই নানা ধরনের খেলা যেমন– লুডু, দাবা, ক্যারম, বাগাডুলি, মোবাইল গেমস্ ইত্যাদি খেলে সময় কাটিয়েছে, টিভিতে প্রোগ্রাম দেখেছে, অনেকে আবার ছাদে গিয়ে ঘুড়ি উড়িয়েছে।

যেসব শিশুরা একটু বড়ো তারা বাবা-মায়ের সাথে ঘরের কাজ করেছে। এই লকডাউনে যেহেতু বাসার বাইরে থাকা গৃহকর্মীদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু বাসার সমস্ত কাজ নিজেদেরই করতে হয়েছে। তাই প্রত্যেক পরিবারেই বাবা-মায়ের সাথে ছেলেমেয়েরাও সব কাজ ভাগাভাগি করে করেছে। কেউ ঘর ঝাড়ু দিয়েছে তো কেউ মুছেছে। কেউ প্লেট-বাটি ধুয়েছে তো কেউ রমজানের ইফতারি বানিয়েছে। আবার বাইরের খাবার কিনে খাওয়া যাবে না দেখে শিশুরাই ঘরে মজার মজার খাবার বানিয়েছে। নিজের কাপড় নিজেরাই ধুয়েছে। নিজের খাওয়ার প্লেট নিজেরাই পরিষ্কার করেছে। এতে তারা কাজ করা যেমন শিখেছে তেমনি এটা শরীর সুস্থ রাখার জন্যও ভালো। সবার অংশগ্রহণে মায়ের কাজের ভারও কমেছে আর আনন্দময় হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ।

লকডাউন পরিণত হয়েছে সুখ যাপনে। এছাড়া এসময় করোনামুক্ত থাকতে শিশুরা ইবাদত বন্দেগিতেও মনোযোগ দিয়েছে। মুসলিম শিশুরা নিয়মিত নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত করেছে। সারা বছর স্কুল, কোচিং, ঘরে পড়া, পরীক্ষা নিয়ে শিশুদের যে নাভিশ্বাস অবস্থা হয় তা থেকে মুক্ত হয়ে শিশুরা বেশ ফুরফুরে থেকেছে এ সময়। ■

গল্প

আকাশ পরি

সনজিত দে

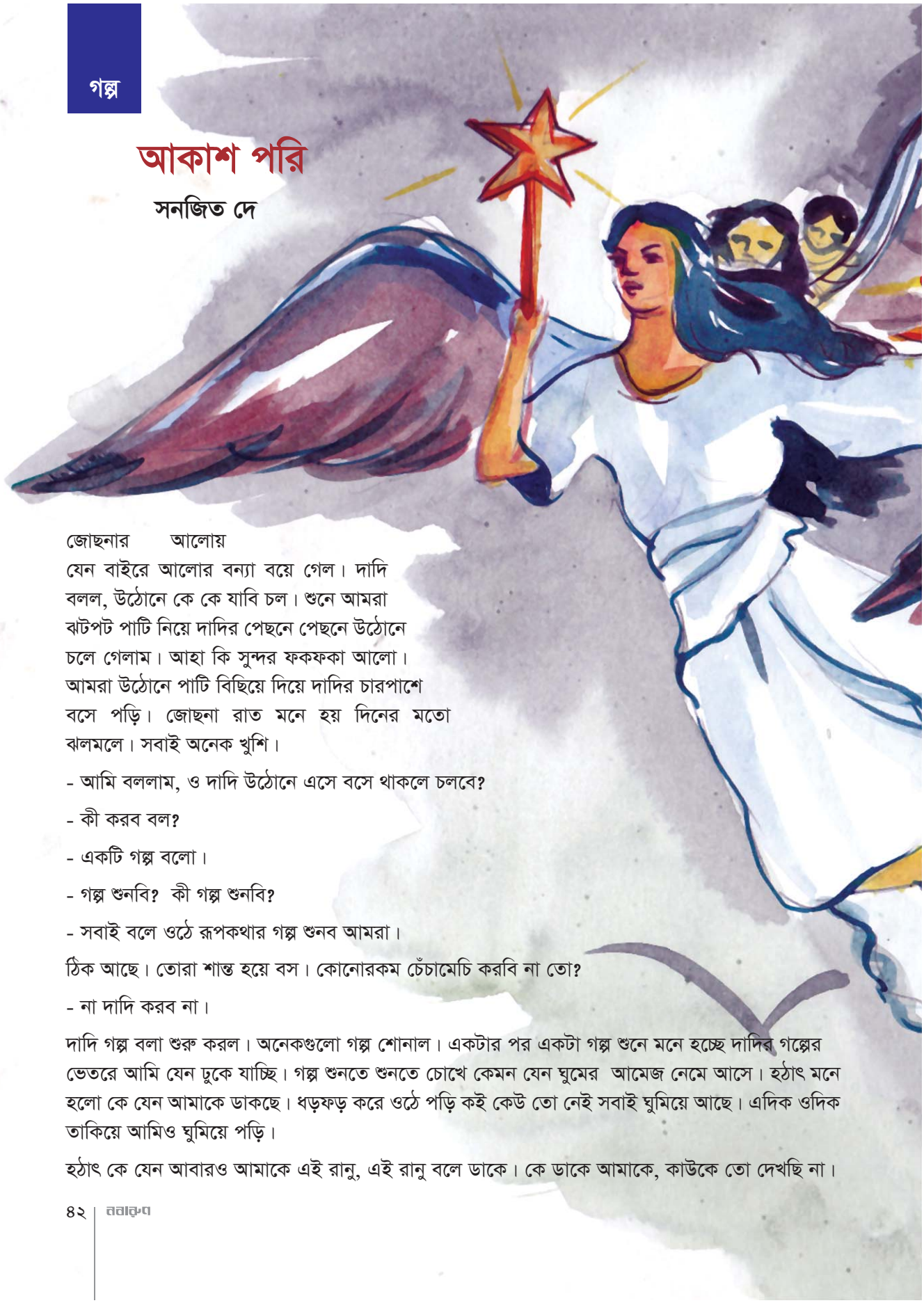

জোছনার আলোয় যেন বাইরে আলোর বন্যা বয়ে গেল। দাদি বলল, উঠোনে কে কে যাবি চল। শুনে আমরা ঝটপট পাটি নিয়ে দাদির পেছনে পেছনে উঠোনে চলে গেলাম। আহা কি সুন্দর ফকফকা আলো। আমরা উঠোনে পাটি বিছিয়ে দিয়ে দাদির চারপাশে বসে পড়ি। জোছনা রাত মনে হয় দিনের মতো ঝলমলে। সবাই অনেক খুশি।

- আমি বললাম, ও দাদি উঠোনে এসে বসে থাকলে চলবে?

- কী করব বল?

- একটি গল্প বলো।

- গল্প শুনবি? কী গল্প শুনবি?

- সবাই বলে ওঠে রূপকথার গল্প শুনব আমরা।

ঠিক আছে। তোরা শান্ত হয়ে বস। কোনোরকম চেঁচামেচি করবি না তো?

- না দাদি করব না।

দাদি গল্প বলা শুরু করল। অনেকগুলো গল্প শোনাল। একটার পর একটা গল্প শুনে মনে হচ্ছে দাদির গল্পের ভেতরে আমি যেন ঢুকে যাচ্ছি। গল্প শুনতে শুনতে চোখে কেমন যেন ঘুমের আমেজ নেমে আসে। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমাকে ডাকছে। ধড়ফড় করে ওঠে পড়ি কই কেউ তো নেই সবাই ঘুমিয়ে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়ি।

হঠাৎ কে যেন আবারও আমাকে এই রানু, এই রানু বলে ডাকে। কে ডাকে আমাকে, কাউকে তো দেখছি না।

- কে ডাকছ আমাকে?

- আমি অনেক দূরের আকাশ থেকে এসেছি। তোমার রূপকথা গল্পের স্বপ্নে দেখা আকাশ পরি।

- কই তোমাকে তো আমি দেখছি না?

- আমরা পরিরা নিজেরা দেখা না দিলে আমাদেরকে কেউ দেখতে পায় না।

- ও এই কথা।

- তুমি আমার নাম জানলে কীভাবে?

- তোমার দাদি যখন বলল এই রানু তাড়াতাড়ি পাটি বিছিয়ে দে। তখন আমি আকাশ থেকে শুনেছি।

- আকাশ তো অনেক দূরে। তুমি কী করে এত দূর থেকে আমাদের কথা শুনেছ? আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আমার সাথে কথা বলছ। আমি তোমাকে দেখতে পারছি না। তোমার সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে না।

-রানু তুমি মন খারাপ করছ?

-করার তো কথা। যার সাথে কথা বলছি তাকে দেখছি না। আমি কি ভূতের সাথে কথা বলছি?

-ও বুঝেছি, তুমি আমাকে দেখতে পারছ না বলে আমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না তাই না ।

- ঠিক তাই।

মুহূর্তে আকাশ পরি রানুর সামনে স্ব-শরীরে হাজির। রানু তো দেখে অবাক। গল্পে শুনেছে পরিদের কথা। পরিরা যে দেখতে এত সুন্দর সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। অবাক কাণ্ড সারা শরীর সোনা রুপা দিয়ে মোড়া। কি সুন্দর পাখির মতো দুটো ডানা।

- এবার খুশি তো রানু।

- রানু বলল খুউব খুশি আমি। তুমি আমার স্বপ্ন দেখা আকাশ পরি। তোমাকে কোথায় বসতে দিই।

- তুমি এত ব্যস্ত হয়ো না রানু। চলো আমরা একটু ঘুরে আসি।

- কোথায়?

- চলো আকাশ পাড়ে?

- দুর বোকা আমি কি পরি? তোমার মতো আকাশে উড়ে যাব? আমার কি পাখা আছে?

- কিচ্ছু লাগবে না রানু।

- না আমি যাব না। আমার ভালো পোশাকগুলো ঘরের ভেতরে। এই পোশাকে কোথাও যেতে ভালো লাগছে না।

- ঠিক আছে তুমি চোখ বন্ধ করো। যা করার আমিই করব।

রানু চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পর আকাশ পরি বলল, এবার চোখ খোলো তো রানু। রানু চোখ খুলে অবাক হয়ে গেল। তার গায়ে আকাশ পরির মতো একই পোশাক। পরির মতো পিঠে দুটো ডানা। ডানা পেয়ে তারা ইচ্ছে পূরণ পাখির মতো পরির রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। পরির রাজ্যের সবকিছু যেন সোনা রূপায় মোড়া । রাস্তাগুলোর চারপাশ যেন ফুলের বাগান। রানুকে পেয়ে সবাই খুশি। মর্ত্যলোক থেকে এসেছে বলে সবাই তাকে আদর আপ্যায়ন করে যাচ্ছে। রাত শেষের দিকে আকাশ পরি বলল, রানু কেমন লাগছে তোমার আমাদের এখানে ? রানু বলল খুউব খুউব ভালো লাগছে। চলো এবার তোমাকে দিয়ে আসি।

- ঠিক আছে চলো, না হয় দাদি চিন্তা করবে।

-তুমি চোখ বন্ধ করো রানু। পরির কথা শুনে রানু চোখ বন্ধ করল। পর মুহূর্তে রানুর কী এক মৃদু শব্দে যেনো ঘুম ভাঙে। ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতে রানু চারপাশে দেখে সবাই কেমন যেন ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে। একসময় আবছা তার মনে পড়ে সেই আকাশ পরির কথা। কিন্তু অবাক কাণ্ড! কোথায় আকাশ পরি? আকাশ পরির সাথে দূর আকাশে পরির দেশে ঘুরে বেড়ানোর কথা কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়। পরির সাথে পরির দেশে ঘুরে বেড়ানোর রেশ যেনো রানুকে কোনো খুশির রাজ্যে নিয়ে যায় । মুহূর্তে রানু যেনো উড়ে এল বিছানায় যে রকম ছিল ঠিক সেই আগের পোশাকে। মুচকি হেসে রানু বলে রাতটা খুব ভালো কেটেছে। স্বপ্নে দেখা পরির সাথে আহা কী মজায় কেটেছে আমার কিছুটা সময় । ■

অনুশোচনা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ফারহান ও বাদিরুল খুব ভালো বন্ধু। তাদের বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি । তারা একই শ্রেণিতে পড়াশুনা করে। কিন্তু তাদের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ খুব কম। দুজন সারাক্ষণ অঘটন ঘটিয়ে চলে। পাড়ার সবাই তাদের চিনে। কারণ পাড়ার এমন কোনো ফলের গাছ নেই, যে গাছ থেকে ফল পাড়েনি। অন্য কেউ খেলেও দায়ভার তাদের উপর দিয়ে যায়। ফলে তাদের বাবা মা সব সময় আতঙ্কে থাকেন। কোনো না কোনো অভিযোগের তীর তাদের দিকে ছুটে আসেই।

ফারহানের বাবা আলফাজ সাহেব সৎ চরিত্রের মানুষ। এলাকায় তার একটা সুনাম আছে। কিন্তু ছেলের জন্য তিনি খুব লজ্জিত। ছেলেকে বার বার বুঝানোর পরও কোনো পরিবর্তন দেখতে পান না। তবুও তিনি আশা ছাড়েন না। তিনি ভাবেন নিশ্চয় সে একদিন পরিবর্তন হবে। কিন্তু ফারহানের মা আয়েশা ভাবেন তার ছেলে কোনোদিন পরিবর্তন হবে না । এর জন্য আলফাজ সাহেবকে দায়ী করেন। তিনি চান ফারহানকে সংশোধন করার জন্য ভালো করে পিটুনি দেওয়া হোক। তাহলে সে অবশ্যই পরিবর্তন হবে। কিন্তু সেটি বিশ্বাস করেন না আলফাজ সাহেব। তিনি মনে করেন ভালোবাসা দিয়েই পরিবর্তন করা যায়। তাই নিয়ে মাঝে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি হয়।

একদিন দুই বন্ধু পরামর্শ করে পাশের গ্রামে একটি নারকেল গাছ আছে, সেই গাছ থেকে নারকেল পাড়বে। ঠিক সময় পৌঁছে যায় নারকেল গাছের কাছে। ফারহান লোকজন দেখার জন্য নিচে দাঁড়ায় এবং বাদিরুল গাছের উপরে উঠে। কয়েকটা নারকেল পাড়ার পরই গাছের মালিক পৌঁছে যায়। ধরে ফেলে ফারহানকে কিছু বুঝার আগেই। বাধ্য হয়ে বাদিরুলও ধরা দেয়।

গাছের মালিক তাদের দিকে তাকিয়ে বলে- তোরা কে? কেমন অচেনা লাগছে। তোদের বাড়ি কোথায়?

তারা ভয়ে ভয়ে একসাথে বলে ওঠে-পাশের গ্রামে।

ফারহানের দিকে তাকিয়ে বলে –তোর বাবার নাম কি ?

ফারহান মৃদু স্বরে বলে –আলফাজ হোসেন ।

তার কথা শুনার পর গাছের মালিক আশ্চর্য হয়ে যায়। আলফাজ সাহেব তো একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ন মানুষ। তার ছেলে এরকম হবে ভাবা যায় না। তিনি আলফাজ সাহেবকে ভালো করে চিনেন। তাই আবার জিজ্ঞাসা করেন ভালো করে বল। না হলে তোকে বস্তায় ভরে জলে ফেলে দেব।

তবুও ফারহান একই উত্তর দেয়।

বাধ্য হয়ে গাছের মালিক আলফাজ সাহেবকে ফোন করেন। খুলে বলেন সব ঘটনা।

আলফাজ সাহেব বাদিরুলের বাবাকে সাথে করে নিয়ে যায় সেখানে। আলফাজ সাহেবকে দেখার পর গাছের মালিক ছেড়ে দেয় তাদের । আফজাল সাহেব বাড়ি নিয়ে আসেন ফারহানকে।

অন্যান্য দিনের মতো ফারহানকে অনেক বুঝায় তার বাবা। আলফাজ সাহেবের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্প। বার বার প্রতিফলিত হয় তার স্ত্রীর কথা। তার মনে হয় আর হয়ত ফারহান পরিবর্তন হবে না।

পরের দিন সকালে ফারহান বাদিরুলদের বাড়ি যায়। আর দ্যাখে বাদিরুল পা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। বাদিরুল বলে তার বাবা মারতে মারতে পা ভেঙে দিয়েছে। তা শুনার পর ফারহান বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসে বাড়ি। নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে। একই ভুলের জন্য বাদিরুলের পা ভেঙে দিয়েছে অথচ সে সুস্থ অবস্থায় ঘুরছে । তার বাবা তাকে কত ভালোবাসে, কোনো দিনও মারেনি। তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করে। জেগে ওঠে ঘুমন্ত বিবেক। অনুশোচনায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এমন বাজে কাজ আর কখনো করবে না। ■

হোম কোয়ারেন্টাইন

কাজী তানভীর

সবার স্নেহভাজন আরাফ। অল্প বয়েসি হলেও লিখে দারুণ। লেখনিতে সবার হৃদয় স্পর্শ করার মতো যোগ্যতা আরাফের আছে। প্রায় মানুষ ওকে পিচ্চি কবি বলে ডাকে। মনে হচ্ছে ওর এই ডাক নামটা চিরকাল বেঁচে থাকবে। বয়োজ্যেষ্ঠ হোক কিংবা মারা যাক, এই নাম বেঁচে থাকবে। পিচ্চি কবি নামটি লোকের মুখে এত সমাদৃত যে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিদের সামনেও সবাই ওকে পিচ্চি কবি বলে ডাকবে হয়ত! আর এতে ও খুব আনন্দ পায়। এমনকি পোষা টিয়েটাকেও ওই নামে ডাকতে শিখিয়েছে আরাফ।

ইদানীং আরাফ সকাল-বিকাল পোষা টিয়েটা নিয়েই পড়ে থাকে। বেলকনিতে টেবিলের একপাশে টিয়ের খাঁচাটা রেখে অন্যপাশে খাতা কলমে বসে বসে গল্প, কবিতা লিখে। টিয়ের সাথে খেলাধুলা করে দিন কাটিয়ে দেয়। টিয়ের মনে হাজারো প্রশ্ন। আরাফের কাছে যে তার উত্তর জানবে তাও সুযোগ নেই। আরাফ যে সাধারণ কবি নয়, মহাকবি! সারাদিন ব্যস্ত। কাগজের সাথে কলমের যুদ্ধ তো চলছেই অবিরত।

একদিন দুদিন নয়, অনেকদিন হলো সে ঘর থেকে বের হয় না। এমনকি নামাজের জন্যে মসজিদেও যায় না। সেটাও ঘরে আদায় করে। সেও বন্দি জীবন কাটাচ্ছে, আমাকে বন্দি করে রেখেছে খাঁচায়। সূর্যের আলো বিছিয়ে পড়া থেকে আলো নিভিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটাই কাজ, ও লিখবে আর আমি দেখব। কী সব যে লিখে!

বুঝিও না। যেমন তেমন প্রশ্ন করলে রেগে মেগে একাকার হয়ে যাবে। অনুমতি নিয়ে বাহিরের হাল চাল দেখে আসি। তারপর না হয় প্রশ্নোত্তর করব। আগামীকাল সকালে বাহিরে বেরুবার অনুমতি নেব। পরদিন সকাল হলো, যে মাত্র আরাফ বেলকনিতে এল অমনি টিয়ে অনুমতি চেয়ে বসল ঘুরতে বেরুবার।

;- ও পিচ্চি কবি, বাহিরের আলো বাতাস পাইনি বহুদিন, আজ একটু অনুমতি তো দাও। অন্যান্য পাখিরা কত্ত উড়াউড়ি করছে। ঘুরছে ফিরছে।

অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তো বেরুতে দাও।

আরাফ,

;- আরে টিয়ে বন্ধু, অত আক্ষেপ করে কেন বলছ।

যাও। প্রত্যেক প্রাণীই নিজ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এটা তার অধিকার। যাও টিয়ে বন্ধু যাও। ঘুরে এসো।

টিয়ে,

;-আচ্ছা যাচ্ছি। শীঘ্রই ফিরব।

এবার টিয়ে পেখম মেলে ঘুরঘুর করে চারপাশ উড়ছে। এই গাছ থেকে ওই গাছে বসছে। এই গ্রাম থেকে ওই গ্রামে যাচ্ছে। টিয়ে ভাবছে, আর মনে মনে বলছে,

;- কী এক অবস্থা। একজন মানুষও বাহিরে নেই যে! শুধু কিছু পুলিশ দেখতে পাচ্ছি। মানুষদের সরব ব্যস্ততা কেমন যেন নীরব হয়ে আছে। নেই কোনো জনসমাগম। নেই বাজার হাট। নেই কোলাহল। নেই অস্থিরতা। সব যেন কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মাটিতে মানুষদের পদাচারণা নেই। আকাশ জুড়ে শুধু পাখিদের সরব আনাগোনা।

বিষণ্ন মনে টিয়ে বাসায় ফিরে এল।

আরাফ,

;- কি টিয়ে বন্ধু এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

টিয়ে,

;- আচ্ছা কবি বন্ধু, বলো তো দেশের এমন বেহাল পরিস্থিতি কেন? দেশের মানুষদের কী হয়েছে? রাস্তাঘাটে কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। না অন্য কোনো ব্যাপার আছে!

আরাফ,

;- না রে বন্ধু। তেমন কিছু না। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। একটা মহামারি। যার নাম নভেল করোনা। উৎপত্তিস্থল হচ্ছে চীন। ক্রমে এসে পড়েছে আমাদের দেশেও। এটি একটি শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সংক্রমণ ব্যাধি। জনসমাগম থাকলে হয়ত সংক্রমণে একজনের কাছ থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে যেতে পারে।

তাই সচেতনতামূলক সব মানুষই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছে। এই হলো মূল কাহিনি।

আর আমার একা একা ভাল্লাগে না তাই তোমাকে আমার কাছ থেকে সরতে দেই নাই। রাগ করো না টিয়ে বন্ধু।

টিয়ে,

;- আরে কবি বন্ধু কী-সব বলো! তুমি তো আমার একমাত্র বন্ধু। আমার নিঃসঙ্গের সাথি তুমি, তেমনি তোমার নিঃসঙ্গের সাথি আমিও। আমি তোমার সাথে সব সময় আছি, থাকব।

আরাফ,

;- অন্তত এমন পরিস্থিতিতে আমাকে সঙ্গ দাও। হয়ত তোমার কষ্ট হবে। আমার যে একা একা ভালো লাগে না তার জন্যে বলছি টিয়ে বন্ধু।

টিয়ে,

;- চিন্তা করো না কবি বন্ধু, এখন তোমার সর্বোত্তম সঙ্গী হচ্ছে তোমার গল্প, কবিতা আর আমি। দোয়া করি সৃষ্টিকর্তা মানুষের উপর থেকে এই মহা মুসিবত ওঠিয়ে নেয়।

আরাফ,

;- টিয়ে বন্ধু, তোমরা তো নিষ্পাপ, তোমাদের দোয়া কবুল হবে বেশি। দোয়া করো যাতে করে আমরা এমন মুসিবত থেকে পরিত্রাণ পাই।

এভাবে হোম কোয়ারেন্টাইন কাটাচ্ছে আরাফের মতো কবিরা, গল্প-কবিতার সাথে। সঙ্গ পাচ্ছে হাজারো মানুষ তাদের পোষা প্রাণীর। মোটামুটি মন ভালো কাটছে অন্তত এভাবে। প্রার্থনা করি, সৃষ্টিকর্তা যাতে আমাদের প্রতি সদয় হন। আমাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হবে না যদি তাতে থাকে বিশ্বাসের দৃঢ়তা। শুভ কামনা বিশ্ববাসীর জন্যে! ■

শারিকা শাহনাজ, ৩য় শ্রেণি, মডার্ন হাই স্কুল, কুমিল্লা।

গল্প

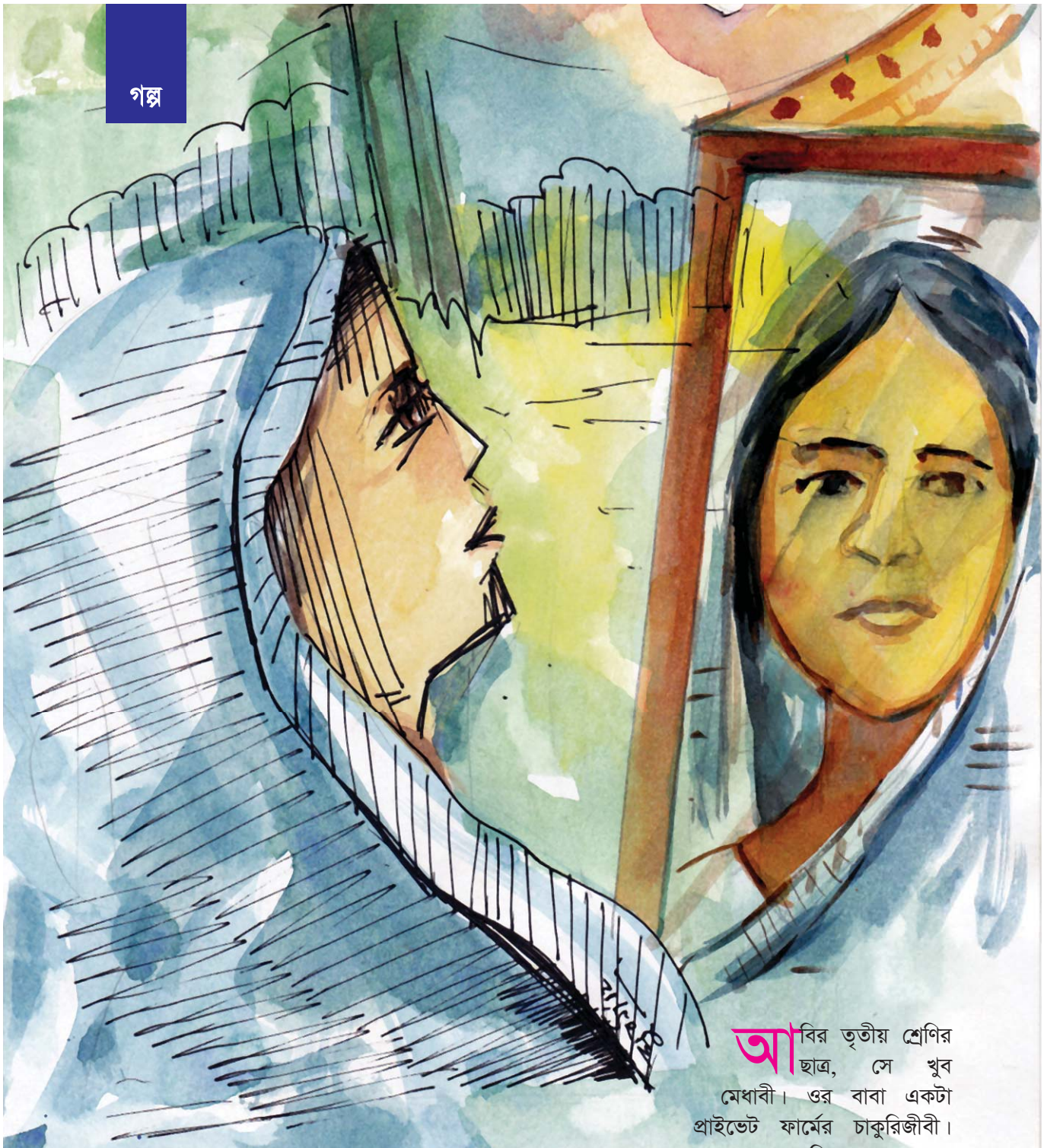

মায়ের আয়না

সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান

আবির তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র, সে খুব মেধাবী। ওর বাবা একটা প্রাইভেট ফার্মের চাকুরিজীবী। গত বছর ওর মা অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে। আজ মা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ওর স্কুলের বন্ধুরা সবাই ব্যস্ত। ক্লাসরুমে বসে কেউ মাকে নিয়ে কবিতা লিখছে, কেউবা সুন্দর করে মায়ের ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। কত জনে কত কিছু যে করছে কিন্তু সেদিকে আবিরের

কোনো খেয়াল নেই। সে চুপচাপ বসে বন্ধুদের কাজকর্ম দেখে যাচ্ছে। মিস এসে জিজ্ঞেস করল, আবির তুমি কেন চুপচাপ বসে আছ? তোমার মাকে সারপ্রাইজ গিফ্‌ট দিতে একটা কিছু করো। আবির তখন চুপ করে থাকতে পারল না। সে মিসকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। মিস তখন জানতে চাইল, আবির তুমি কাঁদছ কেন, কী হলো তোমার? আবির কান্নার স্বরে জানালো, তার মা বেঁচে নেই। তখন মিস ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, তুমি যদি কান্নাকাটি করো, তাহলে তোমার মা কষ্ট পাবে। তুমি হাসিখুশি থাকলে, তোমার মা ভালো থাকবেন। আবির তখন চোখের পানি মুছে ফেলে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করল। তবুও মায়ের শূন্যতায় সে ভেতরে ভেতরে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল।

সবার মা স্কুল থেকে বন্ধুদের নিয়ে যেতে এসেছে। বন্ধুরা সবাই যার যার মাকে সারপ্রাইজ গিফ্‌ট দিচ্ছে। সেই সারপ্রাইজ গিফ্‌ট পেয়ে উনারা খুব খুশি হয়ে বন্ধুদের বেশ আদর করলেন। এই দৃশ্য দেখে আবির আর সহ্য করতে পারছে না। আজ তার মা বেঁচে থাকলে সে কিছু না কিছু সারপ্রাইজ গিফ্‌ট দিত। গত বছর ওর মাকে একটি ছবি এঁকে দিয়েছিল। সেই ছবির একপাশে মায়ের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে চার লাইনে একটা কবিতা লিখে ছিল। সেটা পেয়ে আবিরের মা খুব খুশি হয়ে ওকে অনেক আদর করে ছিলেন। সেই ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে মায়ের বেড- রুমের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিল। আজ মা নেই, তাই মায়ের আদর ও ভালোবাসা নেই। আবারো আবিরের চোখে পানি এসে যায়। এমন সময় ওর বাবা এসে পৌঁছে স্কুলের গেইটের সামনে। প্রতিদিন ওর দাদু এসে স্কুলে দিয়ে যান এবং স্কুল হতে বাসায় নিয়ে যান। আজ ওর বাবাকে দেখে আবির সারপ্রাইজ হয়ে গেল। সে দৌড়ে এসে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আবিরের বাবা ওর কপালে চুমু দিয়ে চোখের পানি মুছে কানে কানে বললেন, আজ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বের হয়ে এসেছি। তোকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘোরাঘুরি করব। আবির বাসায় ফিরে রেডি হয়ে ওর বাবার সাথে ঘুরতে বেরিয়ে গেল। সারা বিকেল ওর বাবার সাথে বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে গেল।

আবির রাতের বেলা স্কুলের পড়া শেষ করে ওর বাবার কাছে গেল। তখন উনি রঙিন কাগজে মোড়ানো ছোট্ট একটা উপহারের বক্স ওর হাতে দিয়ে বললেন, এটা তার মায়ের দেওয়া গিফ্‌টটি। আবিরের মা মারা যাওয়ার আগে আজকের দিনে এই গিফ্‌ট দিতে বলে গিয়ে ছিলেন। প্রতি বছর মা দিবসে আবিরের গিফ্‌ট পাওয়ার পর তিনি আবিরকে কোনো না কোনো কিছু উপহার দিতেন। আবির দেরি না করে বক্সটি খুলে প্রথমে দেখে একটা রঙিন চিরকুট। সেই চিরকুটে ওর মা লিখেছে, আমার লক্ষি সোনামণি, অনেক অনেক আদর। জানি সব সময় আমাকে মিস করিস। আর আজকে মা দিবসে তো ভীষণ রকম মিস করছিস। মন খারাপ করিস না, আমি তোর সাথেই আছি। যদি আমাকে দেখতে চাস, বক্সের ভেতরে ছোট্ট একটি আয়না আছে। ওটায় তাকালেই তুই আমাকে দেখতে পাবি। আবির বক্সের ভেতরে খুব সুন্দর একটা ছোট্ট আয়না পেল। সে ওটার দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে হতাশ হয়ে গেল। সে তার মাকে ওই আয়নার ভেতরে দেখতে পেল না। সে তার বাবাকে বলল, আয়নার ভেতরে যে মাকে দেখতে পাচ্ছি না। আয়নার ভেতরে তো আমিই আমাকে দেখি।

তারপরে ওর বাবা বক্স থেকে আরো একটা রঙিন চিরকুট বের করে আবিরের হাতে দিল। ওই চিরকুটে লিখা ছিল, বোকা ছেলে আমার, মন খারাপ করে ফেলেছিস। আরে বুদ্ধু, তুই কি জানিস না, তুই যে আমারই প্রতিচ্ছবি। যখনই আমার কথা মনে পড়বে, এই আয়নার দিকে তাকিয়ে তোর মাঝেই আমাকে দেখতে পাবি। কখনো মন খারাপ করিস না। তুই হাসিখুশি থাকলেই, আমাকেও হাসিখুশি দেখবি। তখন ওর বাবা আবিরকে বলল, সারাজীবন তোর মায়ের আয়না যত্ন করে রাখবি। আর কখনো মায়ের জন্য কান্নাকাটি করবি না। তোর মা, তোর বুকের ভেতরে বেঁচে আছে। তোর মাঝেই তোর মায়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাবি। তখন আবিরের মন খুব ভালো হয়ে গেল। সে তার মায়ের আয়না খুব যত্ন করে রেখে দিল। ■

ভাষা-দাদু

শব্দ গঠন

তারিক মনজুর

করোনা ভাইরাসের কারণে স্কুল বন্ধ রয়েছে। নেহা আর ওর বন্ধুদেরকে এখন টেলিভিশনে ক্লাস করতে হচ্ছে। টেলিভিশনের ক্লাশের মুশকিলও আছে। মনে প্রশ্ন তৈরি হয়; কিন্তু সেটা টেলিভিশনের স্যারকে জিজ্ঞেস করা যায় না। কী আর করা! নেহা ফোন করল ভাষা-দাদুকে, 'দাদু, কেমন আছ?'

'এখনও পর্যন্ত তো ভালো আছি। ঘরে বন্দি।'

'আজ টেলিভিশনে ব্যাকরণের ক্লাস হয়েছে। বিষয় ছিল শব্দ গঠন।'

'তা বুঝতে সমস্যা হয়েছে বুঝি!' দাদু বেশ মজা পাচ্ছেন। কোনো কিছু বোঝানোর সুযোগ এলেই দাদু মজা পান।

'টেলিভিশনে শব্দগঠনের এতগুলো নিয়ম আলোচনা করল! এতগুলো নিয়ম মনে রাখাও তো কষ্ট!'

নেহার গলা শুনে দাদু হাসলেন। বললেন, 'শব্দ গঠনের তিনটা নিয়ম ভালো করে বুঝলেই আসল কাজ হয়ে যায়।'

'কোন তিনটা নিয়ম?'

ভাষা-দাদু বলতে যাবেন, এমন সময় নেহার মা ডাক দিলেন, 'নেহা, একটু সবজিগুলো ধুয়ে দাও!'

করোনার সময় একটু বেশি বেশি ঘরের কাজ করতে হচ্ছে। নেহার ছোটো ভাই নাবি আগে ঘরের কাজ করতে চাইত না। এখন সেও কাজ করে। মার ডাক শুনে নেহা ভাষা-দাদুকে বলল, 'মা এখন ডাকছে। সবজি ধুতে হবে। একটু পরে ফোন করি, দাদু?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'তা বেশ! এখন তো দুপুর। আমিও গোসল-খাওয়া সেরে নিই।'

নেহা ফোন রেখে সবজি ধুয়ে দিল। ঘর গুছিয়ে ফেলল। এর মধ্যে নাবি একটা গামলায় পানি নিয়ে ডিম ধুয়ে পরিষ্কার করল। কাজ, গোসল আর দুপুরের খাওয়া শেষ করে নেহা ফোন দিল ভাষা-দাদুকে, 'দাদু, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'ঘুমিয়ে পড়লে ফোন কে ধরল শুনি!' ভাষা-দাদু বেশ করে হেসে নিলেন। বললেন, 'আগে দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমাতাম। কিন্তু এই করোনার সময়ে রুটিন সব এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।'

নেহা অবাক হয়ে বলল, 'তোমারও রুটিন আছে নাকি, দাদু!'

দাদু হাসি হাসি গলায় বললেন, 'আমি এখন স্কুলে পড়ি না। কিন্তু একটা রুটিনে তো আমাকেও চলতে হয়।'

'দাদু, এখন বলো, শব্দ গঠনের কোন তিনটা নিয়ম জানতে হবে?'

দাদু এবার বোঝানোর সুযোগ পেয়ে আয়েশ করে বসলেন বিছানায়। বলতে শুরু করলেন, 'বাংলা শব্দ গঠনের নিয়ম মূলত তিনটা – সমাস, উপসর্গ আর প্রত্যয়। একটা শব্দ দেখে যদি বুঝতে পারো, শব্দটা কোন উপায়ে গঠিত, তাহলেই হবে।'

'একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। তাই না, দাদু?' নেহা ব্যাকরণ বইয়ে পড়া কথাটা দাদুকে শুনিয়ে দেয়।

দাদু বললেন, 'আমি বইয়ের মতো করে ব্যাখ্যা করব না। একটু অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। ধরা যাক, একটা শব্দ রাজপুত্র। এই শব্দের দুটি অংশ – রাজ এবং পুত্র। এখানে রাজ মানে রাজা; আর পুত্র মানে ছেলে।'

'রাজ মানে রাজা, আর পুত্র মানে ছেলে – এ তো সবাই জানে!'

'আমি শব্দের অর্থ জানাতে চাচ্ছি না। বলতে চাচ্ছি, যখন শব্দের দুই অংশেরই অর্থ থাকে, তখন শব্দটি সমাসের মাধ্যমে গঠিত।'

'সমাসের উদাহরণে নীলপদ্ম, কাজলকালো এরকম অনেক শব্দই তো দেখেছি।'

'নীলপদ্ম, কাজলকালো এই শব্দগুলো দিয়ে এবার বোঝার চেষ্টা করো। নীলপদ্ম শব্দের দুটি অংশ – নীল আর পদ্ম। এখানে দুটি অংশেরই অর্থ আছে। আবার কাজলকালো শব্দের দুটি অংশ – কাজল আর কালো।'

'হ্যাঁ এখানে কাজল আর কালো দুটি অংশেরই অর্থ আছে। এরকম দুটি অংশের অর্থ থাকলে সেগুলো সমাসের মাধ্যমে গঠিত, বুঝলাম। কিন্তু উপসর্গ আর প্রত্যয়ের মাধ্যমে বোঝার উপায় কী?'

দাদু একটু দম নিলেন। বললেন, 'উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দের ক্ষেত্রে প্রথম অংশের অর্থ থাকে না। আর প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে না।'

দাদু কথাগুলো এতই দ্রুত বলে গেলেন, নেহা কিছুই বুঝল না। তবু চুপ করে রইল। কারণ সে ভালোই জানে, দাদু উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। দাদু বলতে লাগলেন, 'মনে করো, একটি শব্দ পরাজয়। এখানে শব্দের দুটি অংশ – পরা এবং জয়। পরাজয় শব্দের প্রথম অংশের কোনো অর্থ নেই। তাই পরাজয় শব্দটি উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত। আবার আরেকটি শব্দ মনে করো, হাতল। হাতল শব্দের দুটি অংশ – হাত এবং ল। এখানে শব্দের দ্বিতীয় অংশের কোনো অর্থ নেই। তাই হাতল শব্দটি প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত।'

নেহা ফোনে দাদুর কথা শুনে বুঝতে পারছিল। তবু দাদুকে থামিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াও, দাদু, খাতা-কলম নিয়ে আসি।' নেহা চাইছিল, দাদুর কথাগুলোকে গুছিয়ে লিখে ফেলতে।

দাদু বললেন, 'লিখলে তুমি পরে লিখে রেখো। কিন্তু আগে আরেকবার শোনো। ...একটি শব্দকে ভাঙার পরে যদি দুই অংশেরই অর্থ থাকে, সেটি সমাসের মাধ্যমে গঠিত। ভাঙার পরে যদি প্রথম অংশের অর্থ না থাকে, সেটি উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত। আর ভাঙার পরে দ্বিতীয় অংশের অর্থ না থাকলে সেটি প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত।'

'আর, দাদু, যদি কোনো শব্দকে ভাঙা না যায়?'

'ভাঙা না গেলে সেগুলোকে তোমাদের ব্যাকরণে বলে মৌলিক শব্দ।'

ভাষা-দাদুর সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পর নেহা খাতায় লিখল:

১. সমাসের মাধ্যমে গঠিত: নীলপদ্ম

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ
নীল	পদ্ম
√	√

২. উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত: পরাজয়

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ
পরা	জয়
√	√

৩. প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত: হাতল

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ
হাত	ল
√	√

করোনা যুদ্ধে আফিয়া

জান্নাতে রোজী

সারা বিশ্ব যখন ভয়ংকর করোনা আতঙ্কে ভুগছে, লকডাউনে পুরো পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ, চারদিকে অসহায় মানুষের আর্তনাদে ভারী হচ্ছে বাতাস ঠিক সেই সময়টাতে ছোট্ট একটি মাথায় এসেছে দেশকে সাহায্য করার অদ্ভুত এক চিন্তা। আর সে চিন্তা থেকেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

৯ বছরের স্কুল ছাত্রী নূর আফিয়া ফিস্তিনা জামজুরি। করোনা ভাইরাস বিষয়ে তার গভীর কোনো ধারণা নেই। বড়োদের মতো সে এত বুঝতেও চায় না। তবে সে এটা নিশ্চিতভাবে বুঝেছে, এটা একটা ভয়ংকর রোগ। যার সামনে মানুষ বড়ো অসহায়। তাই করোনা মহামারির এই ক্রান্তি লগ্নে দেশকে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে ছিল সে উদগ্রীব। এমন সময় সে জানতে পারে, স্থানীয় একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) সেলাইয়ের জন্য লোক খুঁজছে। তখনই সে স্বেচ্ছায় এই কাজে লেগে পড়ে। এত ছোটো মেয়ে কীভাবে সেলাই করছে? হ্যাঁ করছে, কারণ সে পাঁচ বছর বয়স থেকেই সেলাই পারে। সে দিনে এখন চারটি পিপিই সেলাই করতে পারে। তবে এই কাজ করতে গিয়ে তার অন্য কাজ কিন্তু থেমে নেই। খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া এবং স্কুল বন্ধ থাকায় অনলাইন ক্লাশেও অংশ নিচ্ছে আফিয়া।

এই আফিয়ার বাড়ি কোথায় জানো? ওর বাড়ি মালয়েশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশ নেগেরি সেমবিলানের কুয়ালা পিলাহ শহরে। গত নবারুণ সংখ্যায় তোমাদেরকে আমাদের দেশের খুদে করোনা যোদ্ধা সুত্রা চাকমার কথা বলেছি, যে ছবি এঁকে গৃহবন্দি অসহায় মানুষকে সাহায্য করছে। আজ বিদেশের একজনের কথা বললাম, এটা এ কারণে যে, আমাদের কন্যারা দেশ-বিদেশের কোথাও বসে নেই। সুত্রা, আফিয়ার মতো অসংখ্য আফিয়া আমাদের আছে– আমাদের ভয় কী, আমরা জয়ী হবোই এই মহামারির বিরুদ্ধে। ■

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মাঠে ফুটবল ফিরেছে!

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মাঠে ফুটবল ফিরেছে কথাটি শুনতে একটু হলেও অদ্ভুত লাগছে। তবে বন্ধুরা কথাটা সত্যি। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস ভিয়েতনামে হানা দিলেও সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কম। মৃতের সংখ্যা শূন্য। আর এর মধ্যেই হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভিয়েতনামে। তবে গ্যালারি ও মাঠে প্রবেশের পূর্বে সকলের শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় এবং মাস্ক পড়া ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

ড্রাগন ব্লাড ট্রি

ইয়েমেনের একটি দ্বীপ সুকাত্রা। এ দ্বীপে রয়েছে অদ্ভুত কিছু গাছপালা। এটি লম্বায় ১২০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ৪০ কিলোমিটার। এ দ্বীপে সবচেয়ে অদ্ভুত গাছটির নাম ড্রাগন ব্লাড ট্রি। ছাতার মতো দেখতে এই গাছগুলো। এ দ্বীপে প্রায় ৭০০ রকমের গাছপালা রয়েছে। আরো রয়েছে 'Desert Rose' বা 'মরুভূমির গোলাপ' নামে একটি সুন্দর গাছ।

কলস উদ্ভিদ

কলস উদ্ভিদ। নামটা যেমন সুন্দর, দেখতেও তেমনই সুন্দর। তবে হ্যাঁ, সুন্দর হলেও পোকামাকড়ের কাছে এক আতঙ্ক এই কলস উদ্ভিদ। কারণ ছোটো ছোটো পোকামাকড় খেয়ে এই উদ্ভিদ তাদের চাহিদা পূরণ করে। পৃথিবীতে মোট ৮০ প্রজাতির কলস উদ্ভিদ রয়েছে। ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু অঞ্চলে এই উদ্ভিদ দেখা যায়। কলস উদ্ভিদের পাতা দেখতে অনেকটা কলসের মতো। এর মাথায় ঢাকনার মতো আরেকটা শাখাপত্র থাকে। এ উদ্ভিদের কলসের মুখটা লাল রঙের ফুলের মতো।

মাছের বৃষ্টি!

বন্ধুরা, আমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটে কত বিস্ময়কর ঘটনা। তেমনি এক অদ্ভুত রহস্য হচ্ছে মাছের বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির ঘটনা পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে ঘটেছে। শ্রীলংকার চিলাও জেলায় একটি গ্রাম আছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা মাছ বৃষ্টি দেখেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে মাঠেঘাটে ছড়িয়ে পড়া ছোটো ছোটো মাছ বৃষ্টির পর তারা কুড়িয়ে নেয়। এ যেন এক রূপকথার গল্প। হন্ডুরাসে নিয়মিত মাছ বৃষ্টি এক অদ্ভুত রহস্য হয়ে আছে। মে মাস থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি হয় তুমুল বৃষ্টি, প্রবল বাতাস, বজ্রপাত। অবিরাম বৃষ্টির সাথে মাটিতে আছড়ে পরে অসংখ্য জীবন্ত মাছ। এছাড়াও মেক্সিকোর টামলিপাস প্রদেশের টামপিকো শহরে এ বৃষ্টি হয়।

মাছ সমৃদ্ধ কোনো জলাশয়ের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেলে এমনটা হতে পারে। এ সময় পানিতে থাকা মাছ, ব্যাঙসহ সব উপরে উঠে যায়। একসময় মেঘের ভেতর থেকে ঝরে পড়তে শুরু করে জলজ প্রাণীগুলো। এভাবেই ঘটে মাছ বৃষ্টির ঘটনা।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার

মো. জামাল উদ্দিন

করোনা ভাইরাসের প্রকোপে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের চাহিদা বেড়েছে। মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া আর সেটা সম্ভব না হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারই এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের সবচাইতে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজারে অবশ্যই নূন্যতম ৬০ শতাংশ অ্যালকোহল থাকতে হবে। স্বাস্থ্য সেবায় সংশ্লিষ্ট জনেরা ঘনঘন এই রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করতে বলছেন।

সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিপরীতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার সহজ। তবে যেহেতু এটি রাসায়নিক দ্রবণ, তাই এর অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতিকর দিকও আছে।

মাইক্রোবায়োমের ক্ষতি: ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে স্যানিটাইজার অত্যন্ত কার্যকর একটি উপাদান। তবে এটি শরীরের জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস করে ফেলে। ফলে শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়ার মাত্রায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এর সমাধান একটাই। তখনই এই রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে যখন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ নেই।

ব্যাকটেরিয়াকে শক্তিশালী করা: যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি'র মতে, ব্যাকটেরিয়া নাশক স্যানিটাইজারের ব্যবহার ব্যাকটেরিয়াকে ওই দ্রবণের প্রভাব কমিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী করে তুলতে পারে। তাই সাবান হাতের কাছে না থাকলেই কেবল স্যানিটাইজার হাতে নিতে হবে, অন্যথায় নয়।

ধুলা ও ময়লা দূর করতে কার্যকর নয়: হাতে দৃশ্যমান ময়লা, ধুলা, কালি ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার কোনো কাজে আসে না। জীবাণু ধ্বংস করতেও রাসায়নিক দ্রবণটির কার্যক্ষমতা কমে

যায়। ময়লার ঝুড়ি, ঘর পরিষ্কার, শিশুর ডায়াপার পালটানো ইত্যাদির পরও স্যানিটাইজার কোনো কাজে আসবে না।

হাত শুষ্ক হয়ে যাওয়াঃ তোমরা যারা ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করছ নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কারণ হলো এতে অ্যালকোহল আছে। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

অ্যালকোহল বিষক্রিয়ার ঝুঁকিঃ হ্যান্ড স্যানিটাইজারের গন্ধ নাকে আসার ক্ষতিকর প্রভাব হেলাফেলার যোগ্য নয়। অ্যালকোহলের বিষক্রিয়াও হতে পারে। ব্যবহারের পর হাত শুকানোর আগে ঠোঁট স্পর্শ করলেও সামান্য ক্ষতি আছে। তবে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার হলো হ্যান্ডস্যানিটাইজার গিলে ফেলা।

এই রাসায়নিক দ্রবণ সুবাসিত, উজ্জ্বল রঙের এবং বোতলগুলোও সুন্দর হয়। যা আকর্ষণ করার ঝুঁকি আরো বাড়ায়। তাই শিশুদের থেকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাবধানে রাখতে হবে।

রাসায়নিক উপাদান নিয়ে কাজ করলেঃ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য হ্যান্ডস্যানিটাইজার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান। এর মধ্যে আছে শক্তিশালী পরিষ্কারক উপাদান।

আগুন থেকে সাবধানঃ রান্নাঘরের কাজের সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। হাত পরিষ্কার রাখতে সবচাইতে কার্যকর উপায় সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া। আর সেটা হাতের কাছে না থাকলেই কেবল হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যাবে। ■

ফাতিমা তাহানান, ৪র্থ শ্রেণি, খিলগাও গার্লস স্কুল, ঢাকা।

অনলাইন পড়াশুনা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

নোভেল করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ সংকট তৈরি করেছে। এতে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর যতটা প্রভাব পড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা বা আংশিকভাবে হলেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই জাতীয়ভাবে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাধারণ ছুটির আওতায় আনা হয়েছে।

বাংলাদেশে সাধারণ ছুটি ও সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন বিধি ঘোষণা করা হয় ২৫শে মার্চ থেকে, আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয় ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে। করোনা পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, কবে শিক্ষা ব্যবস্থা সচল হবে, কবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাবে, এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে নেমে এসেছে দুশ্চিন্তার পাহাড়। শিক্ষার ভবিষ্যৎ কী, কেমন হবে পরীক্ষা পদ্ধতি, তারা আদৌ পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা, কবে স্কুল খুলবে ইত্যাদি প্রশ্ন এখন তাদের মনে।

এসকল জল্পনাকল্পনা ও আশঙ্কার কিছুটা অবসান ঘটাতে আমাদের সরকার শিক্ষাধারা অব্যাহত রাখতে চালু করেছে 'আমার ঘরে আমার স্কুল' নামক বিকল্প পড়াশুনা। ইতোমধ্যে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে এটি প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিদিন ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৮ টি ক্লাস হয়। সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত ক্লাসগুলো সম্প্রচারিত হয়। এরপর বেলা ২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত এই ক্লাসগুলোই পুনঃপ্রচার করা হয়। এটুআইয়ের সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর এই ক্লাস সম্প্রচার করছে। এই অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে পর্যায়ক্রমে ক্লাস রুটিন প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিদিন মোট দুটি করে ক্লাস নেওয়া হয়।

সকল ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে ব্যাপক। এই কঠিন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় সক্রিয়

রাখতে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্ব অনেক বেড়েছে।

অনলাইন শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা সাধারণ শ্রেণি শিক্ষা থেকে ভিন্ন। এটি একটি ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি। যা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন হয় আধুনিক প্রযুক্তি, তথা কম্পিউটার, মোবাইল বা এ জাতীয় কোনো ডিভাইস এবং ইন্টারনেট সংযোগ।

মোটকথা, ইন্টারনেট নির্ভর এ যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে কোনো ক্লাস পরিচালনা করাই হলো অনলাইন ক্লাস। যেখানে একজন শিক্ষক ক্লাসরুমের বাইরে যে-কোনো স্থান থেকে ক্লাস নিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ বাসায় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লাইভ ক্লাশে অংশগ্রহণ করে ও একে অপরের সাথে মত বিনিময় করতে পারে।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সরাসরি ক্লাস নেন আর শিক্ষার্থীর কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনই তার ক্লাস পাচ্ছে। এ যেন ফেইস টু ফেইস ক্লাশের মতোই। এমনকি এই ক্লাসগুলো সেভ করা যায় বলে নোট করারও প্রয়োজন হয় না। এছাড়া কেউ লাইভে উপস্থিত না থাকলেও পরে তা দেখতে পাবে। আপদকালীন এ সময়ে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি যে অতি দরকারি তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন এ পদ্ধতির উপর ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই।

আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি, করোনাকালে সেটি বাস্তবায়নের সঠিক সময়। যেহেতু এখন স্কুল কলেজে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং বাসাতেই পড়তে হবে। তাই অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাই এখন গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সকল সংশয় দূর হবে এবং শিক্ষার স্বাভাবিক ধারা অব্যাহত থাকবে। ফলে জাতি হবে শিক্ষায় উন্নত এবং করোনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ■

সোনার বাংলাদেশ

ইফতেখার আলম

এই আমাদের দেশ
সোনার বাংলাদেশ
সুখেদুখে মিলে মিশে
আছি মোরা বেশ।
সবুজ মাঠে হলুদ ক্ষেতে
ফিঙে-দোয়েল নাচে
জালের মতো নদীর বুকে
মাছেরা সব হাসে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা
রং বদলে করছে খেলা
পালা করে চলছে মেলা
উৎসবে-পার্বণে যায় যে বেলা।

দ্বাদশ শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা ছবি

প্রাচুর্য রহমান, নার্সারি শ্রেণি, অনুপম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আজিমপুর, ঢাকা।

আয়ান হক ভূঁঞা, নার্সারি শ্রেণি, স্টার হাতেখড়ি স্কুল, ঢাকা।

কাজী হাসিব আল জাবির, ২য় শ্রেণি, সেন্ট জেবিয়ার্স স্কুল, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

তাশদিদ তাবাসুম, ২য় শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত ইংরেজি নাম, ৫. সাগর/মহামাসগর/নদী বা হ্রদবেষ্টিত স্থলভাগ, ৬.ত্রিশ দিনে হয়, ৭. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ৯. কার্যকারণ নেই অথচ দুইটি ঘটনা একসাথে সংঘটিত, ১২. মাঠ,

উপর-নিচ: ২. হেরোডোটাস কোনো শাস্ত্রের জনক, ৩. ইংরেজি দিনপঞ্জিকার একটি মাস, ৪. রচনাকারী, ১০. বারবার অনুরোধ করা, ৮. সুলক্ষণাবিশিষ্ট, ১১. শাখামৃগ

১.	২.		৩.			৪.	
						৫.	
৬.					৭.		
				৮.			
৯.		১০.					১১.
				১২.			

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত:

আজারবাইজান, জল, আগরবাতি, পালক, ইতিবাচক, আলোকবর্ষ, বাচক, নজর

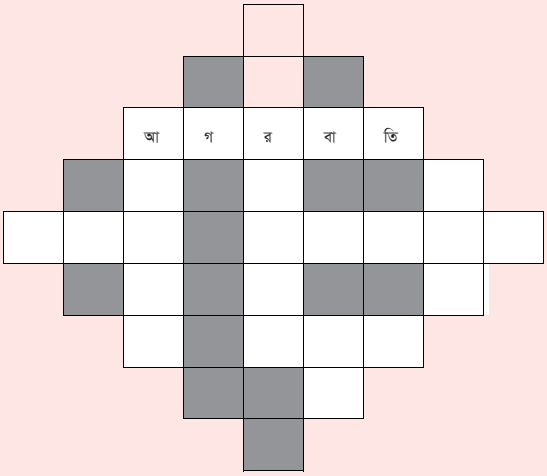

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		-	৭	=	
*		*		-		+
	*	১	+		=	৮
-		-		+		-
৫	*		-	৮	=	
=		=		=		=
	*	২	+		=	১১

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫৭			৫৪	৩১			২৬	
	৬১				৩৩	২৮		২৪
৫৯		৬৩		৩৫			২২	
	৬৫				৩৭	২০		১৬
৬৭		৭১	৫০	৪৯			১৮	
	৬৯		৪৭			১২		১৪
৭৯					৪০			১
	৮১		৪৫	৪২		১০	৩	
৭৭		৭৫			৮			৫

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

এপ্রিল ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধাঁ

ও	য়া	শি	ং	ট	ন	ডি	সি
য়ে	■	■	■	■	র	■	সি
লি	থু	নি	য়া	■	ও	■	লি
ং	■	কা	■	■	য়ে	■	■
ট	■	রা	শি	য়া	■	চি	লি
ন	■	গু	■	■	■	■	বি
■	■	য়া	■	রো	মা	নি	য়া
■	■	■	■	ম	■	■	■

ছক মিলাও

ল								
স	ক	ল						
খা	■	ডা	■	ম				
	■	গ	■	উ	প	হা	র	
আ	খ	ড়া	■	ন	■	সা	■	মা
	■	ছ	বি	■	■	গ	জ	
ড়ি	■	প্র	সা	র				
র	থ	■						
	ম							

ব্রেইনইকুয়েশন

২	*	৫	-	৬	=	৪
*	■	+	■	+	■	-
৩	*	২	-	৪	=	২
-	■	-	■	-	■	-
১	*	৬	-	৫	=	১
=	■	=	■	=	■	=
৫	+	১	-	৫	=	১

নাম্ব্রিক্স

৩৭	৩৮	৩৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫
৩৬	৪১	৪০	৫৯	৫৮	৭৫	৭৬	৭৭	৬৬
৩৫	৪২	৪৫	৪৬	৫৭	৭৪	৮১	৭৮	৬৭
৩৪	৪৩	৪৪	৪৭	৫৬	৭৩	৮০	৭৯	৬৮
৩৩	৩২	৩১	৪৮	৫৫	৭২	৭১	৭০	৬৯
২৪	২৫	৩০	৪৯	৫৪	১৩	১২	১১	১০
২৩	২৬	২৯	৫০	৫৩	১৪	৭	৮	৯
২২	২৭	২৮	৫১	৫২	১৫	৬	৫	৪
২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১	২	৩

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-11, May 2020, Tk-20.00

কাজী নাফিসা তাবাস্‌সুম মাহী
দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা